ফুলন কেন ডাকাত হ'ল

কিরণশঙ্কর মৈত্র

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১/৪, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

তাঁকে

এই গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে যার ভীতি

ও সংশয়ের সীমা ছিল না।

অশিক্ষা আর কুশিক্ষা, অসুখী দাম্পত্য জীবন, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ শেষ হয়ে এক নতুন সমাজ-জীবন গড়ে উঠুক যেখানে অসহায় অজ্ঞ লাঞ্ছিত নারী আর যেন দস্যুবৃত্তির পথে বিতাড়িত না হয়।

এই লেখকের—

শৈলশিখরে নাগাভূমি

নাগাভূমির উপকথা

দেশ-বিদেশের গল্প

চিত্রল-হরিণী (কাব্যগ্রন্থ)

প্রথম পর্ব

ফুলন কেন ডাকাত হ'ল

॥ এক ॥

না, ফুলনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। প্রবল ইচ্ছের তাগিদে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েছিলাম, কিন্তু অসার্থক অভিযান। তাকে ধরবার জন্যে বিশাল পুলিশবাহিনী হন্যে হয়ে ঘুরছে। সে-নারী এখনও মৃগতৃষ্ণিকার ছলনায় অধরা, তার দেখা পাওয়া কি প্রথম প্রয়াসে সম্ভব? কিন্তু আমার পক্ষে আর ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না। একজনার গভীর আকূতি কানে বাজছিল—'আমার চেয়েও কি তোমার ফুলনের আকর্ষণ বেশী?'

দস্যু-সুন্দরী ফুলন দেবী। কিন্তু দেবী তো নয়, কারো কারো কাছে সে দানবীর চেয়ে ভয়ঙ্করী। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল মানবী ফুলনকে আমি কাছাকাছি গিয়ে দেখব।

শুনছি—ফুলনকে নিয়ে বাংলা ও হিন্দী ফিল্ম তৈরী হচ্ছে। জানিনা চলচ্চিত্রের পর্দায় মানবী ফুলনের চিত্র কতোটা রূপায়িত হবে।

ফুলনের জীবনকাহিনী শুধুমাত্র রোমাঞ্চকর নয়—বিশ্লেষণযোগ্যও—ফুলন কেন ডাকাত হলো? সে শুধু অসমসাহসী রমনী নয়, তার নিষ্ঠুরতাও তুলনাহীন। 'ছোড় দিয়া যায় কি মার দিয়া যায়'—হিন্দী ফিল্মের সেই জনপ্রিয় গানটির চিত্ররূপানুযায়ী নিষ্ঠুরতা বাস্তবেই নাকি ফুলন করে তার ধৃত বন্দী হতভাগ্যের উপর। ডাকাতদের কাহিনী-নির্ভর 'মেরা গাঁও মেরা দেশ' ফিল্মের এই গানটি শোনা যায় ফুলনের খুব প্রিয়। রাজস্থানের যে শান্ত জনপদে এই ফিল্মের স্যুটিং হয়েছে, যেখানে ঐ গানটি গাওয়া হয়েছে—দেখে এসেছি, কিন্তু দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার পরেও ফুলনের দেখা পাইনি।

অনেক দুঃসাহসী সাংবাদিক অন্ধকার জগতের অধিবাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে সংযোগ রাখতে চেষ্টা করেন। উভয় পক্ষের আস্থাভাজন

বিশ্বাসী কোনো তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে এই যোগাযোগ ঘটে বিশেষ এক গোপনীয় জায়গায়।

এমনই এক সাহসী সহযোগী তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ফুলনদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করেছিলেন। ফুলনের জন্ম ও বিচরণভূমি জালাউন জেলা থেকে প্রবাহিত যমুনা নদীর এপার থেকে ওপারে তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন দস্যুরাণী ফুলন দেবীকে, পাশে দাঁড়িয়ে ফুলনের প্রেমিক ও ডাকাত-সহযোগী বিক্রম মাল্লা। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী যখনই তিনি নৌকোয় চেপে অপর পারে ফুলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন অকস্মাৎ সেই নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশ পরপর গুলির শব্দে সচকিত বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন—নৌকোর কাঠের পাটাতনের সংগে যতটা সম্ভব একাত্ম হওয়া যায়!

পৈতৃক প্রাণ হাতে করে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন সাংবাদিক। সম্ভবত দ্বিতীয়বার আর ফুলনের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করেন নি।

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে—জানিনা ততদিনে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে কিনা ফুলন। পুরুষ-শাসিত সমাজে, ডাকাত হলেও, রমণী ফুলনের উপর কতোটা সুবিচার হবে জানা নেই। সাধারণ মেয়েদের কামনা বাসনা নিয়ে সে বড় হয়ে উঠছিল উত্তর প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামে। নিয়তি তাকে নিয়ে গেল অপরাধের অন্ধকার জগতে। এক অতি রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতোই আকর্ষনীয় হয়ে উঠল বিপদে-ঘেরা তার জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র অধ্যায়।

ফুলনের চেহারার সঙ্গে সবচেয়ে বেশী মেলে তার পরের বোন রামকলির। ফুলনের কোনো ছবি পাওয়া যায় নি। শোনা যায়, সে রামকলির চেয়ে আর একটু লম্বা ও ফর্সা। রামকলি পাঁচ ফুটের মতো উঁচু। স্বাস্থ্যবতী রামকলির ফুটন্ত যুবতী দেহের বাঁকে বাঁকে, পুষ্ট ওষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গীমায়, ভ্রু-ভংগীতে দুরন্ত আকর্ষণ। রামকলি বলে—'ভগবান কি কাউকে ডাকাত বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়?' রামকলির বক্তব্যানুযায়ী তাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশ আর লোকজনের অমানবিক

অত্যাচারই ফুলনকে ঠেলে দিয়েছে দস্যুবৃত্তির তমিস্রাঘন পথে।

ফুলনের জীবনকাহিনী আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই মনে পড়ে ডাকাত পুতলী বাঈয়ের কথা। নৃত্য-গীতি ঝঙ্কৃত সুরলোক থেকে সে তাড়িত হয়েছিল গুলি বারুদ ধুম্র লাঞ্ছিত রক্ত-পিছল পথে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে। পুতলীর ছিল শুধু একটি হাত। চম্বলের দস্যুসর্দার সুলতান সিং নর্তকী পুতলীর আকর্ষণে তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল। তারপর সুলতান সিংয়ের শিক্ষায় পুতলী হয়ে উঠেছিল এক দুর্ধর্ষ অসমসাহসী দস্যুরাণী, অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ আর মোরেনা জেলায়। আপন যোগ্যতায় ক্রমে সে সুলতান সিংয়ের দলে অর্জন করেছিল দ্বিতীয় স্থান।

পুতলীবাঈয়ের সঙ্গে অনেকটা মেলে ফুলন দেবীর। ফুলনের ইচ্ছে সেও পুতলীবাঈয়ের মতো 'খ্যাতি' ও ক্ষমতা অর্জন করবে। কিন্তু প্রারম্ভিক কিছু কিছু মিল থাকলেও ফুলনদেবী আর পুতলীবাঈয়ে অনেক তফাৎ।

নারী-ডাকাতদের কথা বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সুমন শর্মা, মুন্নী বাঈ, হাসিনা, জনকশ্রী, কুন্তলা, কাপুরী, মীরা ঠাকুর এবং আরও অনেকের কথা। এদের কথা বলব পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে।

এই সব রমণী কেন বেছে নিয়েছিল দস্যুতার মতো রক্তাক্ত আর ভয়ঙ্কর বিপদ-ঘেরা পথ? মেয়েদের স্বভাবজ ধর্মেই ঘর-সংসারের দিকে তাদের মন, শোনিতে চিরন্তন নীড়ের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন হবার পশ্চাতে কোন্ ঘটনার প্রভাব? পারিবারিক জীবনের শান্ত-স্নিগ্ধ ছায়াতপ থেকে তাদের বিপথগামিনী করেছে কোন্ অত্যাচারের অভিশাপ?

ফুলনের জীবন বিশ্লেষণ করলেই আমরা খুঁজে পাব এই সব প্রশ্নের উত্তর।

॥ দুই ॥

উত্তরপ্রদেশের কানপুর শহর থেকে ৮০ মাইল দূরে সিকান্দ্রা পুলিশ সার্কেলের অন্তর্গত বেহমাই গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে কুড়িজন ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোককে ফুলনদেবী দ্বিধাহীন নিষ্ঠুরতায় হত্যা করে ১৯৪১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ফুলনের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সমস্ত মানুষ চমকে ওঠে, লোকের মুখে তার নানা কীর্তি-কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে থাকে, জীবিত কালেই দস্যুসুন্দরী ফুলনদেবী হয়ে ওঠে কিংবদন্তীর নায়িকা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সে ছিল কুসুম-নয়না বা মীরা ঠাকুরের মতো ডাকতদের সেবিকা উপভোগ্য একজন রক্ষিতা মাত্র।

বেহমাই গ্রামে ফুলনের নির্বিচার নরহত্যার পরে এক বিশাল শক্তিশালী পুলিশবাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে তাকে ধরবার জন্যে। কিন্তু ফুলন বুঝি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত তাকে ধরা যায় নি।

বেহমাই-ঘটনার পরে যে পুলিশ অফিসারের শৌর্য ও বীরত্ব অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে তিনি হলেন ইনস্পেক্টর মুলচাঁদ। উত্তরপ্রদেশের গৃহরাজ্য মন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মুলচাঁদ ঘোষণা করেছিলেন— 'হয় ডাকাতদের আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব—নয়ত সংঘর্ষে আমিই শেষ হয়ে যাব। ডাকাতদের হাতে পুলিশের এই অবমাননা অসহ্য।'

উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ কর্মজীবন ও ৬৭টি পুরস্কার-পদকের অধিকারী মুলচাঁদ তাঁর ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ফুলনদেবী বলবান গাদারিয়া দস্যুদলের সঙ্গে এক ভয়ানক সংঘর্ষে লিপ্ত হন বারখেদা গ্রামে। আর অতি নিষ্ঠুরভাবেই বাস্তবে রূপ পায় মুলচাঁদের ঘোষণা।

এস. পি শ্রী উমাশঙ্কর বাজপাই দু দিন আগেই কুখ্যাত জাগরাম ডাকাতদলের নয় জনকে নিহত করেছিলেন। শ্রী বাজপাই ডি. এস. পি.

শ্রী আই. পি. চাঁদকে নিয়ে ফুলনের দলবলের সঙ্গে সংগ্রামের এক পরিকল্পনা নিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তিরাহি গ্রামে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারল যে ফুলনদেবী মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই সে-জায়গা থেকে চলে গেছে। কিন্তু সেখানে ফুলনের সহযোগী ডাকাত বলবানের উপস্থিতি নিশ্চিতরূপে তারা জানতে পারল। সকাল সাড়ে ছটায় মূলচাঁদের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে শুরু হলো এক খন্ড যুদ্ধ।

এস. পি বাজপাই ওয়্যারলেশে এই খবর পাবার পরেই ঘটনাস্থলে রওনা দিলেন। পরিস্থিতি প্রতিকুল দেখে ডাকাতদল বিউতা নদীর ধারে জঙ্গলের দিকে পশ্চাদাপসরণ করতে থাকে।

৩২ কিলোমিটার দূরে ডাকাতদলকে এক গভীর জঙ্গলের চারদিক থেকে অবরোধ করা হয়। সেখানে এক ইঁটের পাঁজার পিছনে আত্মগোপন করে দস্যু বলবানের দল।

পুলিশ দলের নেতা ইনস্‌পেক্টর মূলচাঁদ ও কাড়ুয়া থানার ষ্টেশন অফিসার রামায়ণ সিং বুকে হেঁটে ইঁটের পাঁজার দিকে এগোতে থাকেন।

মূলচাঁদ জানতেন না যে অলক্ষ্যে তাঁর গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছে ডাকাত বলবান। সহসা অব্যর্থ লক্ষ্যে রাইফেলের গুলিতে বলবান বিদ্ধ করল মূলচাঁদকে। মূলচাঁদও মরবার আগে সব শক্তি একত্র করে তাঁর গুলিতে শেষ করে দিলেন কুখ্যাত দস্যু বলবানকে। মরবার আগে কর্তব্যনিষ্ঠ বীর মূলচাঁদ তাঁর শেষ ওয়্যারলেশ ম্যাসেজ পাঠালেন —'স্যার, আমার গায়ে মারাত্মকভাবে গুলি লেগেছে···আমার বাঁচবার আশা নেই···কিন্তু ডাকাতদের পালিয়ে যেতে দেবেন না···জয় হিন্দ··· ওভার টু য়্যু···'

মূলচাঁদের মৃত্যুতে তাঁর সহযোগী পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রতিশোধের উন্মাদনায় তারা এল-এম-জি থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ এবং হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মারতে লাগলেন ইঁটের পাঁজার

দিকে। কিন্তু ডাকাতদলের আত্মসমর্পনের কোনো লক্ষণ দেখা দিল না। অবশেষে বেলা আড়াইটের সময় ইঁটের পাঁজার পিছন থেকে আর ডাকাতদের গুলির শব্দ শোনা গেল না। তবু পুলিশবাহিনী কোনো ঝুঁকি না নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পরে শ্যাম গুপ্ত নামে এক ব্যবসায়ী, যাকে বলবানের দল অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, ইঁটের পাঁজার ওদিক থেকে দু' হাত উপরে তুলে সাদা রুমাল জড়িয়ে বেরিয়ে এলো। পুলিশকে সে এসে জানাল যে ডাকাত দলের ছ'জন মারা গিয়েছে।

শ্যাম গুপ্তকে অপহরণ করার পরে তার পরিবার বর্গ এক লাখ টাকা মুক্তিপণ দিতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু বলবানের দাবী ছিল দু'লাখ।

দস্যু বলবান-ফুলন দেবী দলের যে ছ'জন ডাকাত মারা গিয়েছিল তারা হলো বলবান গাদারিয়া, লাল্লু গাদারিয়া, বৃন্দাবন গাদারিয়া, শ্যাম গাদারিয়া, রামপ্রকাশ, কুশওয়াহা এবং বলরাম সিং চৌহান।

এই ডাকাতদলের সংগে এর আগে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে চৌদ্দবার। এদের অপরাধের তালিকায় রয়েছে—পাঁচটি হত্যা, চৌদ্দটি ডাকাতি, একুশটি অপহরণ, দুটি দস্যুবৃত্তি।

এর আগে ২১শে ফেব্রুয়ারী জালাউনের পুলিশ দু' জন অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছিলেন কুখ্যাত জাগ্রাম চামার ডাকাতদলের ন'জন দস্যুকে নিহত করে। জালাউন, এটোয়া, কানপুর অঞ্চলে এই দস্যুদল এক বিভীষিকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল দীর্ঘদিন ধরে।

বেহমাই গ্রামে ফুলনের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের পরে, পুলিশের এই সাহসিকতাপূর্ণ কৃতিত্ব স্বভাবতই তাদের ভিতরে সাহস ও মনোবল জাগিয়ে তুলেছে। তারা নতুন উদ্যমে ফুলন দেবীকে ধরবার জন্যে তাঁদের শক্তি নিয়োজিত করেছেন।

ডাকাতদলের সঙ্গে সংঘর্ষে ইনসপেক্টর মুলচাঁদ বীরের মতো মৃত্যু বরণ করার পরে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং যখন মৃতের বিধবা পত্নী শ্রীমতী মীনাকে সান্ত্বনা জানাচ্ছিলেন—মীনার

চোখে তখন ছিল না বেদনার সজল অশ্রু, বরং সেখানে জ্বলে উঠেছিল স্বামীহন্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের দৃপ্ত আগুন। তাই বিধবা মীনা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 'পুনর্বিবাহে'র অনুরোধ জানিয়েছিলেন 'বন্দুকের সঙ্গে। তাঁর সে আবেদন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্জুর করেছেন। শ্রীমতী মীনা মুলচাঁদ এখন উত্তর প্রদেশের পুলিশ বিভাগের একজন সাব-ইন্‌সপেক্টর।

॥ তিন ॥

বেহমাই গ্রামের ঠাকুর সম্প্রদায়ের সাতাশ জন লোককে দুপুরের প্রখর আলোয় যমুনা নদীর তীরে জড়ো করে দস্যুরাণী ফুলন দেবীর আদেশে তার ডাকাতদল সেই হতভাগ্যদের উপর নির্বিচারে গুলি বৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলেই কুড়ি জন মারা যায়। এই ঘটনার পরেই সরকার ফুলনকে ধরবার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়োগ করেছেন। ফুলনের মস্তকমূল্য ধার্য হয়েছে দশ হাজার টাকা। পুলিশবাহিনীর প্রচেষ্টা অব্যাহত। শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকার নয়, তাদের সংগে সহযোগিতা করছেন মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থান সরকারও।

পূর্ণ যুবতী ফুলনের রূপবতী দেহে জ্বলে উঠেছিল কোন্ প্রতিহিংসার আগুন? এই ভরন্ত যৌবনে পাশবিক নিষ্ঠুরতায় কেন সে হত্যা করেছিল ঠাকুর সম্প্রদায়ের এতগুলি লোককে? এর কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ফুলনের জন্মভূমি ও পারিবারিক পরিবেশে। কিভাবে কেটেছে তার শৈশব-কৈশোর আর সদ্য-যৌবনের সেই দিনগুলি? তার জীবনের সেই দিনগুলির ঘটনাপঞ্জী বিশ্লেষণ করে দেখলে হয়ত আমরা উত্তর খুঁজে পাব—ফুলন কেন ডাকাত হলো?

বেহমাই থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলায় গড়া-কা-পুরবা গ্রাম। অদূরে যমুনা। চারিদিক ঝিল-জংগল—পাহাড়-খাদ-ঘাটি-ইত্যাদিতে ভরা।

এখানকার জংগলে একদিকে যেমন রয়েছে বিচিত্র প্রজাপতি ও ময়ূর তেমনি অন্যদিকে বিষধর সাপ, হিংস্র বুনো শুয়োর, হায়েনা, শেয়াল, নীল গাই, হরিণ প্রভৃতি।

এখানকার প্রধান ফসল গম, অড়হর ও মসুর ডাল। অনেকে চোলাই মদের কারবারও করে।

এই প্রাকৃতিক পরিবেশে গুড়া-কা-পুরবা গ্রামে এক গরীবের ঘরে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফুলনের জন্ম। পিতা দেবীদিন ও মা মুলির সে দ্বিতীয়া কন্যা। তার আরও পাঁচ বোন ও এক ভাই। দেবীদিনের জীবিকা নির্বাহ হতো মাঝি (দেবীদিন মাল্লা সম্প্রদায় ভুক্ত)-ও মিস্ত্রী-মজুর বা সুতো বোনার কাজ করে। দরিদ্র ঘরের এই মেয়েটিকে দশ-এগারো বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় তার চেয়ে তিন গুণ বড় মহেশপুর গ্রামের বিপত্নীর পুত্তিলালের সংগে। ফুলনের মা-বাবা জামাইকে অনুরোধ করছিল যে বছর তিনেক পরে মেয়ে আর একটু বড় হলে ('গউনা' হয়ে গেলে) তাকে স্বামীর ঘর করতে পাঠানো হবে। কিন্তু পুত্তিলাল সে অনুরোধে কান দেয় নি। তার ঘর-সংসারের কাজ কে করবে? রান্না-বান্না? স্ত্রীর কর্তব্য?

ফুলন সে সময়ে এক সতেজ সাবলীল সুন্দরী কিশোরী। প্রকৃতির অবারিত পরিবেশে অবাধ আনন্দে খেলাধুলো করার খুশীয়ালী তার মনে। বয়সে তিনগুণ বড়ো স্বামীর সঙ্গে সে কি করে নিজেকে মানিয়ে নেবে? সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সে গল্প করত, ক্রীড়া-কৌতুকেও তার কমতি ছিল না।

পুত্তিলাল বা তার মায়ের ঘরের বউয়ের এই স্বভাব একদম ভালো লাগল না। দু'জনেই মারধোর করে বউয়ের স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করল। না পেরে কিছুদিন পরেই পুত্তিলাল তাকে বাপের বাড়ী ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। ফুলনের বাপের বাড়ীর লোকেদের তারা জানিয়ে দিল— এ মেয়ে খুশীমতো যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, ঘরের কাজকর্ম জানে না, যার তার সঙ্গে কথা বলে, ফুলনের স্বভাব চরিত্র ভালো নয়। এমন

বউকে তারা আর রাখবে না।

ফুলনেরও ইচ্ছে নয় রূঢ় ও কঠোর প্রকৃতি পুত্তিলালের কাছে ফিরে যাবার। পরিবারের লোকের এবং গাঁয়ের মোড়লের প্রবল তাড়না সত্ত্বেও সে পুত্তিলালের কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করল। ফুলনকে তাই এক সম্পন্ন কৃষাণ তার খুড়ো গুরুদয়ালের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এখানে এসেও স্বস্তি ছিল না ফুলনের। সারাদিন ক্রীতদাসীর মতো খাটতে হতো তাকে, তার উপর গুরুদয়ালের ছেলে মায়াদীন তার দেহ উপভোগের জন্যে সর্বদা সচেষ্ট। অস্বীকার করলে সেখান থেকেও বিতাড়িত হলো ফুলন।

স্বামী পরিত্যক্তা এই প্রাণোচ্ছলা কিশোরী বাউন্ডুলে মেয়ে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল গরীব মা-বাবার কাছে। অতিষ্ঠ হয়ে ফুলন নিজেই এই সমস্যার সমাধান করে নিল। ইন্দ্রজিৎ নামে মস্তান-প্রকৃতির একটি লোকের সঙ্গে বাস করতে লাগল সে। পুত্তিলাল তার বিবাহিত স্ত্রীর এই অসামাজিক কাজ সহ্য করল না। গাঁয়ের পঞ্চায়েতের কাছে সে স্ত্রীর পুনরুদ্ধারের আবেদন জানাল। গ্রাম-বৃদ্ধদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফুলনকে আবার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে হলো তার প্রবল ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ঘরে এনে পুত্তিলাল এবার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে উচিত শিক্ষা দিল প্রচন্ড মার দিয়ে। শাশুড়ী এবং অন্যান্য সবাইর দিনরাত্রি নানা ধরনের অকথ্য শারীরিক যন্ত্রনায় ফুলনের জীবন বিষময় করে তুলল। অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে আবার সে বাপের বাড়ীতে পালিয়ে এলো।

পুত্তিলালও বিয়ের সময় ফুলনকে যে রুপোর গহনা দিয়েছিল তা ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শেষ হয় তাদের বিবাহ-সম্পর্ক।

মা-বাবা ফুলনকে খুব গালাগালি করত স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসবার জন্যে। তাকে বলত—যমুনায় ডুবে মরতে। ফুলনও যথাসাধ্য মা-বাবার দৃষ্টির আড়ালে থাকবার জন্যে ক্ষেতে মোষ চরাত অথবা যমুনায় ফেরী নৌকো চালাত।

সময় এগিয়ে চলে। রেওয়ারিশ যৌবনবতী সুন্দরী ফুলন গাঁয়ের

লালসাতুর পুরুষের কাছে এক লোভনীয় নারী দেহ। তাদের লালসার আগুন থেকে অবিরাম নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ফুলন নাজেহাল। এই সময় চরম বিপদ দেখা দিল তার জীবনে। গাঁয়ের সরপঞ্চের ছেলে রাস্তার মাঝখানেই তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ফুলন প্রতিবাদ করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্যে শাসিয়ে যায় সরপঞ্চের ছেলে।

কয়েকদিন পরে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়িয়ে দিল গাঁয়ের মোড়লের মেয়ে তাকে তীক্ষ্ন বিদ্রূপে জর্জরিত করে স্বামী পরিত্যক্তা অসৎ চরিত্রের মেয়ে বলে গালি দিয়ে। ফুলনও তাকে ছেড়ে দিল না। মোড়লের মেয়েকে সে-ও দু-চার ঘা লাগিয়ে দেয় তাকে অপমানজনক কথা বলবার জন্যে।

ফুলন এবার অনেকটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ-পর্যন্ত পীড়ন, প্রহার, অপর্যাপ্ত আহার, লোভী পুরুষের লালসাদৃষ্টির অত্যাচার ছাড়া আর কি সে পেয়েছে?

উত্তরপ্রদেশের দূর সীমায় দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর কুসংস্কারে ঘেরা অনুন্নত গ্রামে কামনা-বাসনা-ক্ষুধার স্বাভাবিক জৈবিক তাগিদে আক্রান্ত একটি সদ্য যুবতী মেয়ে সব আশ্রয় খুইয়ে কোন্ পথে যেতে পারে? এক এক করে সব আশ্রয়ের দরজায় সে মাথা কুটে মরেছে। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে খেয়ে এত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করলেও ফুলন তখন এক আকর্ষণীয় সতেজ সুন্দরী গ্রামিকা। যৌবন সমাগমেই তার দেহের বন্য বন্ধুরতা পুরুষের মনে অদম্য মোহ জাগায়। গায়ের রঙে গমের গৈরিকা, নাতিদীর্ঘ দেহে ঈষৎ ভারী স্তন, পুষ্ট ওষ্ঠ, দৃষ্টি ও ভ্রূভংগীতে কামনার তীব্র আহ্বান। প্রায় বৃদ্ধ স্বামী ফুলনের দেহে শুধু বাসনার আবেদন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তৃপ্তি দিতে পারে নি। অফুরন্ত তার প্রাণ-প্রাচুর্য। স্বাভাবিক দেহজ জৈব কামনাকে সে অস্বীকার করে না। তাই আবার ফুলনের জীবনের বাঁক ফেরে, দেখা দেয় নতুন বৈচিত্র্য।

নদীর অপর পারে তেওদা গাঁওয়ে ফুলনের বড় বোন রুক্মিনীর বিয়ে হয়েছে। ফুলন বেড়াতে গিয়েছে সেখানে। সেদিন বিকেল বেলা

নদীর ঘাটে স্নান করছিল এক তরুণ মাল্লা। নাম তার কৈলাশ। দূরে সম্পর্কে আত্মীয়তাও আছে তার সঙ্গে। ফুলনের শরীরে যৌবনের উত্তাপ। সেও নদীর জলে স্নান করতে নামে। কৈলাশের কাছে সাবান চেয়ে নেয়, গায়ে মাখে। কৈলাশের দৃষ্টি আটকে যায় যৌবনবতী ফুলনের দেহে ফুলনের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। নিঃসঙ্কোচে সে অবগাহন করে তার দেহের সম্পদ-সম্ভার অনাবৃত করে।

কৈলাশ বিবাহিত। চার ছেলেমেয়ের বাপ। ঘরে যুবতী স্ত্রী। কিন্তু ফুলনের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। পরের দিন কাছের আখের ক্ষেতে তাদের দেহ-মিলনে দেরী হয় না। কিন্তু এই ত্বরিৎ ও ক্ষণিক মিলনে প্রেমিক-যুগলের তৃপ্তি কোথায়? ফুলনের আপত্তি নেই পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পনে কিন্তু তার আগে সর্ত—বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে কৈলাশকে।

কৈলাশ দিশেহারা। ঘরে স্ত্রী-সন্তান। কিন্তু সব তুচ্ছ হয়ে যায়। ফুলনের দেহের বাঁকে বাঁকে এত আনন্দের অভিজ্ঞতা থরে থরে সাজ্জিত যার বিন্দুমাত্র সে স্ত্রী-সঙ্গমে কখনও উপলব্ধি করে নি। কৈলাশ কি করবে?

শেষপর্যন্ত ফুলনকে নিয়ে সে কানপুর শহরে এক উকিলের বাড়ীতে যায়। উকিল মহাশয় একটি কাগজে কিছু লিপিবদ্ধ করে পঞ্চাশ টাকা ফিস নেন কৈলাশের কাছ থেকে এবং ঘোষণা করেন যে—এখন থেকে কৈলাশ এবং ফুলন বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী।

দু'দিন তারা উকিলের বাড়ীতে কাটায়। দিনে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় মনের আনন্দে, সিনেমা দেখে, চায়ের দোকানে, রাতে রতি-রভসে অন্তহীন মিলন সুখে।

তারপর কৈলাশ তেওদা গ্রামে ঘরে ফিরে আসে। কিন্তু কৈলাশের পিতামাতা ও স্ত্রী তার 'নব বিবাহিতা' পত্নী'কে 'স্বাগত' জানায় তাদের সম্মিলিত প্রহারে ফুলনের সমস্ত শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে তারা তাড়িয়ে দেয় ফুলনকে। হতভাগিনী ফুলন।

দুঃখের আগুনে ঝলসানো দেহ-মনে আবার বাপের বাড়ী গুড়া-কা-পুরবায় ফিরে আসে সে।

ফুলনের জীবনের এই অধ্যায়টি অধিকতর দুঃখ-কষ্টে যন্ত্রণাজর্জর।

কানপুরে গিয়ে কৈলাশকে 'বিয়ে' করার খবর পেয়ে সরপঞ্চের ছেলে আরো ক্রুদ্ধ। ফুলনকে শুধু জুতো দিয়ে মেরে ক্ষান্ত হয় না, আরও কঠিন শিক্ষা দেবার জন্যে সে বদ্ধপরিকর।

ওদিকে ফুলন চলে যাওয়ায় কৈলাশের জীবন শূন্য। পাশের গাঁয়ে তখন মেলা বসেছিল। ফুলন গিয়েছিল সেই মেলায়। সেখানে কৈলাশের স্ত্রী শান্তি এবং তার সন্তানেরা ফুলনের চুল ধরে হিংস্র ক্রুর বিড়ালের মতো তাকে মারে, তার মুখ ফালাফালা করে দেয় নখরাঘাতে এবং সংগে সংগে অকথ্য গালিগালাজ—'রান্ড,' 'কুত্তী,' 'ঘর ভাঙানী'—মেলার সব লোকজনের সামনে। মেলার লোকেরা এই ঘটনাটি বেশ রসিয়ে উপভোগ করে—বিনে পয়সায় ফালতু মজা !

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস ! পার্শ্ববর্তী গ্রামে ফুলনের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে এই সময় একদিন ডাকাতি হলো। তাদের সংগে ফুলনের বাবার আবার আগে থাকতেই জমিসংক্রান্ত একটা বিবাদ চলছিল। প্রতিশোধ পরায়ণ আত্মীয়েরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করল যে তাদের বাড়ীতে ডাকাতির পেছনে রয়েছে ফুলনের প্ররোচনা ও পরিচালনা। ফুলনের নানা বদনাম তো আগে থাকতেই ছিল। ফলে ফার্ষ্ট ইনফর্মেশন রিপোর্টে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকায় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হলো সমাজতাড়িতা ফুলনের নাম। পুত্তিলালের নাকি সক্রিয় সহযোগিতা আছে ফুলনের নাম অভিযুক্তদের তালিকায় যুক্ত করার পশ্চাতে। সরপঞ্চের ছেলে তো এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা আরো যোগ করে দিল যে—ফুলনের সংগে ডাকাতদলের যোগাযোগ রয়েছে। ফুলনের সহায়তায় এই ডাকাতি হয়েছে। অথচ ডাকাতির দিনে ফুলন গ্রামেই ছিল না।

এই ঘটনা ফুলনের জীবনে ঘনিয়ে আনল গভীর কালিমা, এর

পরেই বদলে গেল স্বাভাবিক জীবন-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এক যৌবনবতী গ্রামিকার সমগ্র জীবনের ধারা।

১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারী ফুলনকে গ্রেপ্তার করে তিন সপ্তাহ জেলে রাখা হয়েছিল। অনেকের ধারণা পুলিশের তত্ত্বাবধানে থাকবার সময় সে নানাভাবে অত্যাচারিতা হয়, এমন কি ধর্ষিতাও।

এ পর্যন্ত এই একবারই অভিযুক্ত হয়ে এবং পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ফুলন বন্দীজীবন কাটিয়েছিল।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পরেও কিন্তু ফুলনের লাঞ্ছনার শেষ হয়নি। কিছু দিন পর পরই পুলিশ এসে তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে এবং অভিযোগ করে যে সে-লুকিয়ে ডাকাতদের আশ্রয় ও আহার জোগাচ্ছে। বস্তুত তখন পর্যন্ত কোনো ডাকাতদলের সংগেই ফুলনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় নি, যদিও সম্ভবত পরোক্ষ ভাবে সে কাউকে কাউকে জানত। কিন্তু জীবনের এই অধ্যায় থেকেই অপরাধের অন্ধকার ও গোলাবারুদে ভরা পথে সে তাড়িত হলো।

মুকুলিত যৌবন থেকেই সবার কাছে অবাঞ্ছিত ফুলন—তার আপন জন কেউ তাকে চায় না। তার মা-বাবা তাকে চায় না; স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে; কৈলাশ তাকে বৃথা আশ্বাস দিয়েছে, পত্নীরূপে গ্রহণ করেনি; যে-সব লোক তার দেহ উপভোগ করেছে কেউ তার মনের দিকে তাকায়নি, দেয়নি স্ত্রী'র স্বীকৃতি।

জীবনের এই পর্যায়ে তার কাছে শুধু দুটি পথই খোলা ছিল—হয় যমুনার জলে ডুবে মরা, নয়তো শহরে গিয়ে দেহোপজীবিনী হয়ে বেঁচে থাকা।

ফুলন জগতের কঠিন শিক্ষা পেয়েছিল জীবনের চরম অভিজ্ঞতা ও ঘাত-প্রতিঘাত এবং অত্যাচারের মাধ্যমে। নারী-হৃদয়ের সব সুকোমল বৃত্তির অপমৃত্যু ঘটেছিল, তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল এক দুর্দম, দুঃসাহসী, প্রতিশোধ-কামী নিষ্ঠুর রমণীর। যার রক্তাক্ত বহিঃপ্রকাশ পরবর্তীকালে।

॥ চার ॥

ফুলন সেদিন একলা তার গাঁয়ের যমুনা নদীর তীর দিয়ে যাচ্ছিল। একটু পরে সে খেয়াল করল যে—দু'জন লোক তাকে অনুসরণ করছে। ফুলন যখন তাদের প্রশ্ন করল তারা একটু হেসে উত্তর দিল যে ফুলনদের বাড়ীতে আবার তাদের দেখা হবে।

লোকদুটির হাসি ফুলনের বুকের মধ্যে চমক জাগিয়েছিল। অপসূয়মান যুবক দুটির গমনপথের দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল। তারপরেই তার সমস্ত শরীরে ভীতির শীতল প্রবাহ: লোক দুটি কুখ্যাত ডাকাত-নেতা বাবু গুজ্জর ও তার সহযোগী বিক্রম মাল্লা। কৈলাশের সঙ্গে এদের যোগাযোগের কথা তার মনে পড়ে গেল।

কৈলাশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পরে ফুলনের জীবনে ডাকাত বিক্রম মাল্লার আবির্ভাব।

বিক্রমের ছিল পেশীবহুল লম্বা ফর্সা চেহারা। ফুলনের প্রতি আগে থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিল সে।

একদিন ফুলনের মা-বাবার কাছে এসে ফুলনকে নিয়ে যেতে চাইল বিক্রম। ফুলন বল্লে—"তোর মতো দাগী-ডাকুর সঙ্গে কে যাবে রে?"

বিক্রম রেগে গেল ফুলনের কথায়। কিন্তু ফুলন তেজের সঙ্গে বলেছিল—"আমি তোর সঙ্গে কি কথা বলব? আমার পায়ের চপ্পলই তোর সঙ্গে কথা বলবে!"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাটিতে থুথু ফেলেছিল সে।

ক্রুদ্ধ বিক্রম তার হাতের চাবুক চালিয়েছিল ফুলনের উপর।

ফুলন সেদিন ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তার দিদি রুক্মিনীর বাড়ীতে।

এর পরেই ফুলনের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগে পরোয়ানা আসে এবং ফলে তাকে দু'সপ্তাহ জেলে কাটিয়ে আসতে হয়।

বাড়ী ফিরে এলে আবার বিক্রম মাল্লা ও বাবু গুজ্জর তাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়। সে-রাতে ফুলনদের বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে পড়েছিল ডাকাতদের প্রচণ্ড আঘাতে। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে ভীতি-বিহ্বল লোকগুলি দেখল তাদের ঘিরে বাবু গুজ্জর আর বিক্রম মাল্লার নেতৃত্বে পাঁচটি ডাকাত। ফুলনকে বলা হলো চুপচাপ তাদের সঙ্গে চলে আসতে। যদি না-যায়, তারা ভয়ও দেখাল, ফুলনের একমাত্র ছোটভাই শিবনারায়ণকে তুলে নিয়ে যাবে তারা।

এগারো বছরের একমাত্র ছোটভাই শিবকে খুব ভালোবাসে ফুলন। বিক্রমের ধমকে কাজ হয়। এবার সে বিক্রমের সঙ্গে যেতে রাজী হয়।

বুঝি ফুলনের অখ্যাতি, রূপ আর মন্দভাগ্যই ডাকাতদের আকৃষ্ট করেছিল তার দিকে। আর নিয়তি তার চুলের মুঠি ধরেই নিয়ে গেল এক ভয়াল ভবিষ্যতের দিকে।

কালো অন্ধকারে ছাওয়া ফুলনের জীবনের নতুন সকাল হলো নিকটবর্তী এক জনশূন্য গভীর জঙ্গলে। শুরু হলো সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়। জন্ম নিল দস্যুরাণী ফুলন দেবী।

তার লম্বা চুল ছোট করে ছেঁটে দেওয়া হলো; খুলে নেওয়া হলো শাড়ী, তার জায়গায় খাকি ট্রাউজার, ব্লাউজ ছুঁড়ে ফেলে গায়ে স্মার্ট সার্ট আর হাতে তুলে দেওয়া হলো এক আগ্নেয়াস্ত্র—২২ বোর মাস্কেট।

প্রথমে দলের সবার উপভোগ্যা ছিল ফুলন—তার ভালো লাগে চাই নাই লাগে। যদিও দলে তার অলিখিত 'মর্যাদা' বাবু গুজ্জরের মিস্ট্রেস—উপপত্নী। বাবু গুজ্জরের বর্বর নিষ্ঠুরতা ছিল সীমাহীন। নারী হিসেবে ফুলনের কোনো বিশেষ সম্মান বা মর্যাদা ছিল না তার কাছে। কামোত্তেজিত হলেই যখন খুশী সে দলের লোকের সামনেই প্রকাশ্য দিবালোকে ফুলনকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে উপভোগ করত।

বাবু গুজ্জরের এই পাশবিক ব্যবহারে নাগিনীর মতো নিজের মধ্যে

ফুঁসছিল ফুলন। বাবু গুজ্জরের ডান হাত বিক্রম মাল্লা তারই স্বজাতি। ফুলনের এই লাঞ্ছনায় সে সংগোপন সমবেদনায় ব্যথিত। স্বাভাবিক নারী-অনুভূতিতে ফুলন এ-কথা বুঝতে পেরেছিল। বিক্রমের সঙ্গে তার মিলনের পালা এলে বাবু গুজ্জরের বর্বর ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ করত সে। তার প্রতি বিক্রমের সহানুভূতি ও আকর্ষণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ফুলন। জীবনের কঠিন শিক্ষাকে কাজে লাগাল সে।

ফুলনের প্ররোচনায় বিক্রম মাল্লা একদিন রাইফেলের গুলিতে শেষ করে দিল নিদ্রিত কুখ্যাত দস্যু, বাবু গুজ্জরের ঘৃণিত জীবন, আর সঙ্গে সংগে তার দুই অতি বিশ্বাসী অনুগামীকেও। বিক্রম ফুলনকে একটি ট্রান্সিস্টর রেডিয়ো ও একটি ক্যাসেট রেকর্ডার দিয়েছিল। কারণ ফুলন হিন্দী ফিল্মের গান শুনতে খুব ভালোবাসে।

এবার ফুলন শুধু বিক্রমের রক্ষিতাই নয়, ডাকাতদলের মধ্যে পদমর্যাদাও পেল সে। বিক্রম ডাকাত হলেও তার মধ্যে ছিল পুরুষোচিত শৌর্য, ফুলনকে সে নারীর সম্মান দিয়েছিল। সম্ভবত জীবনে এই প্রথমবার একটি পুরুষের প্রতি সত্যিকারের প্রেমাবেগ অনুভব করল ফুলন। শোনা যায় একটি সন্তানও সে লাভ করেছে বিক্রমের সংগে মিলনে।

বিক্রম আস্তে আস্তে ফুলনকে সব আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় দক্ষ করে তুলল, তাকে শিক্ষিত করে তুলল দস্যুবৃত্তির বিভিন্ন নিপুন কলা-কৌশলে। দলের মধ্যে ফুলনের স্থান এখন দ্বিতীয়—সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড—বিক্রমের পরেই। ফুলনের তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে বিক্রম তার কাজকর্মে ও দস্যুবৃত্তিতে ফুলনের পরামর্শ নিতে লাগল।

বিক্রম দলের নেতা হবার পরে ফুলনকে সে একমাত্র নিজের উপভোগ্যা প্রেমিকা করে নিল। তখন থেকে অন্য কোনো ডাকাত তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

দলের লোকেরা ফুলনকে না-পেয়েও আপত্তি করল না। কারণ

দলে তখন অন্য একটি মেয়ে এসেছে। নাম কুসুমনয়ন। সে ফুলনের চেয়ে দেখতে সুন্দর। কুসুমনয়ন ছিল ঠাকুর, আর মূলত ঠাকুর লালারাম-শ্রীরামের রক্ষিতা।

কুসুমনয়ন দলে অসবার পরেই দেখা দিল দুই নারীর চিরন্তন ঈর্ষা। সেই সংগে শুরু হলো ঠাকুরান কুসুমনয়ন ও মাল্লায়িন ফুলনের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ।

দলের মধ্যে ফুলনের এই পদোন্নতি ও মর্যাদা দলের সবাই কিন্তু সুনজরে দেখেনি। বিশেষ করে বিক্রমের পূর্বতন প্রধান সহযোগী শ্রীরাম ও লালারাম সিং। ফুলন একটা মেয়েছেলে মাত্র, সে বিক্রমের শুধু রক্ষিতা হয়েই থাক, ডাকাতদলের নেত্রী হবার কোনো অধিকার তার নেই। লালারাম আর শ্রীরাম ফুলনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেবার জন্যে মনে মনে বিক্রমের প্রতি গজরায়।

প্রসংগত উল্লেখ্য—শ্রীরাম ও লালারাম দুই যমজ ভাই ঠাকুর সম্প্রদায় ভুক্ত আর বিক্রম ও ফুলন মাল্লা সম্প্রদায়ের। জাতিগত বিদ্বেষের বিষবাষ্প এই সময় থেকেই ধূমায়িত হতে থাকে যার আগ্নেয় পরিণতি বেহমাই গ্রামের ঠাকুর সম্প্রদায়ের কুড়িজন মানুষের হত্যার মধ্যে।

—পাঁচ—

ওদিকে পুলিশবাহিনীর নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত দস্যুদলকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে। তারা হন্যে হয়ে খুঁজছে বিক্রম মাল্লার দলকে। পুলিশ বিশ্বস্তসূত্রে বিক্রম মাল্লার সংগে শ্রীরাম লালা-রামের মতভেদ ও চাপা উত্তেজনার খবর পেয়ে গিয়েছিল। পুলিশ কোনক্রমে শ্রীরাম সিংহের সংগে সংযোগ স্থাপন করে তাকে আশ্বাস দিল যে—সে যদি বিক্রম মাল্লাকে খতম করার মদৎ দিতে পারে এবং দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে তবে সরকার তার কথা সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনানুযায়ী তার সংরক্ষণের ভার নেবে।

বিক্রম দলের নেতা হবার পরে ফুলন ছিল তার একান্ত নিজস্ব

রক্ষিতা। কিন্তু দলপতি হিসেবে কুসুমনয়নকেও বিক্রম উপভোগ করত। ফলে লালারাম শ্রীরাম বিক্রমের উপর ক্ষেপে যায়। তারা ইতিমধ্যে তাদের অনুগামীদের নিয়ে পৃথক এক ডাকাতদল গড়ে তুলেছিল।

দ্রুত ঘটনার রঙ বদলাতে থাকে। লালারাম শ্রীরাম এই সময়ের একদিন কোনো ছুতোয় বিক্রমকে বেহমাই গ্রামে ডেকে আনে। তারপর রাতের অন্ধকারে অতি সংগোপনে গুলিবৃষ্টিতে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দেয় বিক্রমের দেহ (১২ আগস্ট, ১৯৮০ খৃ.)।

কিন্তু পুলিশের বয়ান অনুসারে বিক্রম নিহত হয়েছিল পুলিশের সঙ্গে 'এনকাউন্টারে'—সামনাসামনি সশস্ত্র সংঘর্ষে', লালারাম শ্রীরাম দ্বারা গুপ্তহত্যায় নয়।

জঙ্গলের এক শার্দুলের বিনাশ হলো বটে, কিন্তু পেছনে থেকে গেল এক অসম সাহসিনী বাঘিনী! প্রতিহিংসায় সে ভয়ঙ্করী।

বিক্রমের মৃতদেহের উপর বেহমাই গ্রামের ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকেরা বারবার পদাঘাত করেছিল—থুথু ফেলেছিল অসীম ঘৃণায়! এই সমস্ত আঘাতই ফুলনের বুকে বেজেছিল তীব্রভাবে। বস্তুত বিক্রমের বিনাশ ফুলনের জীবনে এক চরম আঘাত। বিক্রম তাকে দিয়েছিল রমনীর ইজ্জৎ, পত্নীর সম্মান। শুধু ডাকাত সর্দারের প্রতি আনুগত্যই নয়, ফুলন বিক্রমকে সমর্পন করেছিল তার নারী হৃদয়ের সব ভালোবাসা।

বিক্রম মাল্লার হত্যাকাণ্ডের পরে দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করল ঠাকুর লালারাম শ্রীরাম। এবার ফুলন তাদের সম্পূর্ণ কবলিত। যদিও মর্মান্তিক অন্তর্দাহ ও প্রতিহিংসাস্পৃহা ফুলনের মনে অহর্নিশি অংগারের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিল—তবু পরিস্থিতির চাপে পড়ে সব কিছু সে মনের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখল। শ্রীরাম লালারামের নেতৃত্বও মেনে নিল। ডাকাত দলের মধ্যে ফুলনের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী—শ্রীরাম লালারামের উপপত্নী কুসুমনয়ন। কুসুমনয়ন লালারাম শ্রীরামের মনে মাল্লা বনাম ঠাকুর সম্প্রদায়ের জাতিগত বিভেদের কথা তুলে ক্রমাগত ফুলনের বিরুদ্ধে তাদের মন বিষিয়ে তুলতে লাগল। সুযোগ পেয়ে লালারামও নানাভাবে অপমান

করতে লাগল ফুলনকে। ফুলনকে আটকে রেখে দেওয়া হয়েছিল বেহমাই গ্রামের মধ্যে। বেহমাই গ্রামবাসী তাকে মারধোর ও ধর্ষণ করে বলে শোনা যায়।

সমস্ত গ্রামবাসীর সামনে একদিন লালারাম ফুলনকে আদেশ করল পাতকুয়ো থেকে তার পা ধোবার জল আনবার জন্যে। বীর দস্যুনেতা বিক্রম মাল্লার যে ছিল প্রিয়তমা প্রনয়িনী—ডাকাত দলে যার স্থান ছিল দ্বিতীয়—তার কাছে এর চেয়ে বেশী অপমান আর কি হতে পারে?

ধিকিধিকি তুষের আগুনের মতো প্রতিশোধের স্পৃহা ফুলনের যন্ত্রনাদগ্ধ অপমানিত অন্তরে। অবিরাম সে প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

একদিন রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যাবার অছিলায় ফুলন পালায় এবং রাতের অন্ধকারে যমুনা পার হয়ে চলে যায় মাল্লা-অধ্যুষিত পাল-গ্রামে। সেখানে গিয়ে অন্য এক ডাকাত-সর্দার বাবা মুস্তাকীমের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

ঐ অঞ্চলের নাম-করা মুসলমান ডাকাত 'বাবা' মুস্তাকীম। বছর চল্লিশ তার বয়স। ডাকাত হলেও মহিলাদের প্রতি তার ব্যবহার ছিল সৌজন্য ও সম্ভ্রমপূর্ণ। ফুলনের প্রতি শ্রীরাম লালারামের হীন অপমান-জনক আচণের কথা তার কানে এসেছিল। ফুলন তার অসহায় অপমানিত অবস্থার কথা জানিয়ে তাকে অনুরোধ করলে সে ফুলনের সংগে সহযোগিতায় রাজী হলো।

ওখানকার প্রায় একশ স্কোয়ার কিলোমিটার অঞ্চলে ডাকাত মুস্তাকীমের ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। মুস্তাকীম ফুলনকে দস্যুবৃত্তির কঠিনতর অনুশীলনে শিক্ষিত করে তুলতে লাগল এবং ফুলন দেবী অচিরে আবার মুস্তাকীমের দলে সহনেত্রীর পদ লাভ করল। একসংগে তারা কয়েকটি দুঃসাহসী ডাকাতি অভিযান চালাল।

ফুলন কিন্তু লালারাম শ্রীরামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কথা কখনও ভোলেনি।

প্রসংগত যমুনার ওপারে টিলার উপরে মাল্লা অধ্যুষিত পাল-গ্রামের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

বেহমাইয়ের মধ্য দিয়ে পাল গ্রামের মাল্লারা আসত যমুনা নদীতে এপার-ওপার, নৌকোয় ফেরী করতে। বেহমাই গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে ঠাকুর সম্প্রদায়ের ছেলেরা মাল্লা মেয়েদের নানাভাবে নির্যাতন করত, মাল্লা-ছেলেদের প্রহার এমন কি, অনেকের অভিযোগ—মাল্লা মেয়েদের উলংগ ক'রে তাদের নাচতেও বাধ্য করত ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকেরা।

মাল্লারা ফুলনের কাছে আবেদন করেছিল—ঠাকুরদের উচিত শিক্ষা দিয়ে এই অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যে।

তারপর এলো সেই রক্তাক্ত দিনটি। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ খৃঃ। দস্যু-অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি থেকে পি-এ-সি (পুলিশ এ্যান্ড প্রভিন্সিয়াল আর্মড কনস্টাবুলারি)-র ভারী প্রহরাকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয় উত্তর প্রদেশের সীমান্তে কিষান র‍্যালির সুষ্ঠু শৃংখলা রক্ষার জন্যে। তিনটি কম্পানীতে দুশো সশস্ত্র জওয়ান বাহিনী কমিয়ে মাত্র অল্প কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী ঐ এলাকায় পাহারার জন্যে রেখে দেওয়া হলো। ফুলনের কাছে অচিরে এ খবর পেঁৗছে গেল। ডাকাতদলের নিজস্ব 'ইন্টেলিজেন্সে'র মধ্যে শিশু থেকে বৃদ্ধ—সব ধরণের লোক রয়েছে। তারা, পুলিশের গতিবিধির খবর যথাসময়ে তাদের কাছে পেঁৗছে দেয়।

ফুলন আরও জানতে পেরেছিল যে কুসুমা নয়নের জমি সংক্রান্ত বিবাদের ব্যাপারে ঐ সময় লালারাম শ্রীরাম বেহমাই গ্রামে আসবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী শনিবারের বেলা দুপুর। কানপুর শহর থেকে ৯৫ কি. মি. দূরে যমুনা নদীর তীরে অখ্যাত 'চৌরাশিয়া' (৮৪ ঘরের) গাঁও বেহমাই। অধিবাসীরা প্রায় সবাই ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত। সশস্ত্র পুলিশের বেশে ফুলন দেবী মুস্তাকীমের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন ডাকাতের একটি দল বেহমাইকে ঘিরে ফেলল। ডাকাতদের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

ফুলনের পরনে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর খাকি কোট, কাঁধের পোষাকে তিন তারা রৌদ্রালোকে ঝকঝক্ করছে, নীল রঙের জীনস্, ঘাড়-ছাঁটা চুল, জিপার লাগানো বুট জুতো পায়ে, ঠোঁটে লিপস্টিক, নখে রঙ।

কোমরে গুলিভর্তি বেল্ট, বাঁকা গোর্খা খুকরি ঝুলছে, কাঁধের উপর স্টেনগান, হাতে ব্যাটারি চালিত মেগাফোন।

বাবা মুস্তাকীম নির্দেশ দেয়—জনা বারোর দল রাস্তা পাহারা দেবে যাতে গ্রাম থেকে বাইরে কেউ পালাতে না-পারে।

দ্বিতীয় দল ফুলনের নেতৃত্বে বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালাবে এবং খুশী মতো ধনসম্পত্তি-অলঙ্কার লুঠ করবে। কিন্তু মেয়েদের ধর্ষণ বা অত্যাচার করা চলবে না। কাউকে হত্যা করাও যাবে না—কেবল দু'জন ছাড়া, তারা হলো লালারাম ও শ্রীরাম।

ডাকাতদল প্রথমে শিব মন্দিরের পৈঠায় বসেছিল এবং অভিযানের আগে মন্দির-দ্বারে মাথা নত ক'রে নির্দেশমতো কাজ করতে এগোয়।

ফুলন মুখে মেগাফোন লাগিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে—"আমি ফুলন দেবী। আমার কথা মন দিয়ে শোন। জয়, দুর্গা মাতা।"

ফুলন আকাশের দিকে একটি গুলি ছুঁড়ে বলে—"লালারাম-শ্রীরামকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও…"

প্রথমে চল্‌লে লুট পাট। টাকা পয়সা-গয়না দিতে অস্বীকার করলে নির্দয় প্রহার। মেয়েরাও রেহাই পায় না। নিষ্ঠুর ভাবে তাদের কানের দুল, নাকের রিঙ, পায়ের মল ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

ফুলন দেবী তার দুই সহযোগী ডাকাত রাম অবতার আর মানসিংহকে সংগে নিয়ে গ্রাম-প্রধান তকদীর সিংয়ের বাড়িতে গ্রামের সমস্ত পুরুষ মানুষকে জড়ো করল। মহিলা ও শিশুদের বাড়ীর বাইরে আসতে মানা করে দিল। সেখানে এসে ফুলনের সংগী ডাকাত উচ্চকণ্ঠে বললে—'গ্রামবাসীরা, শ্রীরাম আর লালারামকে আমাদের হাবালৎ করে দাও। তোমাদের সংগে আমাদের কোন দুষমনী নেই। লালারাম আর শ্রীরামকে

পেলেই আমরা চলে যাব। আর লালারাম শ্রীরামকে যদি আমাদের হাবালৎ করে না দাও তো তোমাদের গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেব, বন্দুকের গুলিতে তোমাদের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। কেউ রেহাই পাবে না।'

সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে কোনো প্রত্যুত্তর এলো না। ডাকাতরা আবার লালারাম শ্রীরামের কথা জিজ্ঞেস করল। ফুলন দেবীর দৃঢ় বিশ্বাস যে—বেহমাই গ্রামের ঠাকুররা ঠাকুর লালারাম-শ্রীরামকে গ্রামের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। কারণ ডাকাত হলেও লালারাম-শ্রীরাম ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত হবার দরুন ঠাকুর অধ্যুষিত বেহমাই গ্রামের সর্বপ্রকার রক্ষণাবেক্ষণ করত।

কোনো উত্তর না-পেয়ে ফুলনদেবী রেগে আগুন। গ্রামবাসীদের সে অতি ভয়ানক পরিণতির হুমকি দিল। তখন গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ জবাব দিল—'লালারাম-শ্রীরামের খবর আমরা জানিনা।'

এই উত্তরে ফুলন জ্বলে উঠল রাগে। সে তার সঙ্গী ডাকাতদলকে নিয়ে পরবর্তী কর্মসূচী রূপায়নে অগ্রণী হলো। সমস্ত মহিলা ও শিশুকে নিজের নিজের বাড়ীতে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হলো। তারপর গ্রামবাসীদের মধ্যে বেছে বেছে সাতাশ জনকে সারবন্দী করে দাঁড় করিয়ে তাদের যমুনা নদীর তীরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। যেসব মহিলা আর্তকণ্ঠে করুণ আবেদনে তাদের স্বজনদের ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাতে জানাতে পেছনে আসছিল নিষ্ঠুর প্রহারে তারা ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

বেলা দেড়টার সময় এই হতভাগ্যের দল যমুনা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। সেখানে আবার তাদের প্রচুর মারধোর ক'রে শেষ বারের জন্যে শ্রীরাম-লালারামের কথা জিজ্ঞাসা করা হলো। কেউ তাদের কথা বলতে পারে না। সাতাশ জনের দলকে উপরে হাত তুলে হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ দেওয়া হলো। ফুলন দেবী ইস্পাত কণ্ঠে বলল—শ্রীরাম-লালারামকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, মদৎ দিয়েছ, তোমাদের আমি রেহাই দেব না।' এরপর ফুলনদেবীর আদেশে দস্যু

বাহিনীর গুলিবৃষ্টিতে অন্তিম চীৎকারে একের পর এক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মন্দভাগ্য মানুষের দল। নীল যমুনা নদীর তীরে বয়ে যেতে থাকে লাল রক্তের ধারা।

'ফুলনদেবী কী জয়' 'মুস্তাকীম কী জয়', 'রাম অবতার কী জয়' ধ্বনি দিতে দিতে ডাকাতদল দস্যুরাণী ফুলনের নেতৃত্বে তমসাঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

খানিকপরে ডাকাতদলের প্রস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বেহমাইয়ের নারী, শিশু ও মুষ্টিমেয় যে-কজন পুরুষ ভাগ্যক্রমে রেহাই পেয়েছিল তারা আর্তনাদ করতে করতে যমুনা নদীর তীরে ছুটে এলো। সবাই আপন জনকে সনাক্ত করবার চেষ্টা করে। দেখা গেল—সাতাশ জনের মধ্যে ঘটনাস্থলেই উনিশ জন মারা গেছে ডাকাতদের গুলিতে। সাত জন গুরুতর ভাবে আহত। তাদের মৃত ভেবে ডাকাতরা ফেলে রেখে চলে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা এদের কানপুরে হাসপাতালে ভর্তি করাবার জন্যে নিয়ে চলল। পথে যেতে যেতে তিনজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বাকী চার জনকে উর্মলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলো পুলিশের সহায়তায়। পাশের গাঁয়ের একজন লোক এসেছিল রেহমাই গ্রামে মজুরের কাজ করতে জীবনের এক অশুভক্ষণে। যমুনা নদীর তীরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে আর তার খোঁজ পাওয়া যায় নি।

ডাকাতদলের গুলি খেয়েও সৌভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের একজন কৃষ্ণ স্বরূপ। উর্মলা হাসপাতালে তাকে ডাকাতির কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে—ফুলনদেবী যখন দলবল নিয়ে তাদের গ্রামে ঢোকে তখন তারা ভেবেছিল অন্যবারের মতো এবারেও অন্য এলাকার ডাকাতরা তাদের গ্রামে লুটপাট করতে এসেছে। টাকা পয়সা নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু গ্রামে এসে ফুলনদেবী বারবার শ্রীরাম আর লালারামের কথাই জিজ্ঞাসা করছিল। বলছিল—তাদের আর কিছুই চাই না। বারবার হুমকি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল যে—শ্রীরাম-লালারামকে যারা আশ্রয় দেবে তাদের রেহাই নেই।

ফুলনদলের গুলিবৃষ্টিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল দেবপ্রাগ সিং-ও। সামনের সারির পেছনে সে অন্যদের মতোই হাঁটু গেড়ে দু'হাত উপরে তুলে বসেছিল। বুকে আর পায়ে গুলি লেগেছিল তার। নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়াবহ বিভীষিকার মধ্য থেকে রেহাই পাওয়া মানুষদের বর্ণনায় একটু আধটু হেরফের স্বাভাবিক। দেবপ্রাগ বলে যে—সেই দুঃস্বপ্নের দিনটিতে অন্তত চল্লিশ জন ডাকাত গ্রামে এসেছিল। তারা গ্রামের জনা ত্রিশেক পুরুষ মানুষের পিঠে বন্দুকের নল রেখে তাদের প্রথমে গায়ের পাতকুয়োর সামনে নিয়ে যায়। সেখানে ডাকাতদের একদল তাদের পাহারা দেয়, অন্যদল শুধু সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল চারদিকে, ডাকাতদের তৃতীয় দলটি বাড়ী বাড়ী ঢুকে টাকা পয়সা লুট করে আর খোঁজে শ্রীরাম-লালারামকে।

ফুলনের চীৎকার সেই ভয়াবহ পরিবেশে আরো বিভীষিকার সৃষ্টি করছিল—'আমাদের কেউ বাধা দিলে তাকে কুত্তার মতো গুলি করে মারা হবে।' সে শ্রীরাম-লালারামকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল ইঁদুরের মতো লুকিয়ে না থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্যে।

সাতাশ জনের সেই দল বারবার মিনতি করছিল তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে। বলছিল—তারা শ্রীরাম-লালারাম সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কিন্তু ফুলন তাদের কথা বিশ্বাস করে নি। যমুনা নদীর ধারে তাদের নিয়ে, রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে দলবলসহ প্রকাশ্য দিবালোকে চলে যায়।

—ছয়—

নদী-নালা-খাদ পাহাড়ী ঘাটি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের জন্যে ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এটোয়া, এটা, মইনপুরী, কানপুর, জালাওন—উত্তরপ্রদেশের এই জায়গাগুলির ৮০ স্কোয়ার কিলোমিটার অঞ্চলে প্রধানত দস্যুদলের বিচরণ ক্ষেত্র। প্রায় ৪০টি ডাকাতদলের মধ্যে ফুলনদেবী, ছবিরাম পাথি ও মালখান সিংয়ের দল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বেহমাই-হত্যাকাণ্ডের পরে সবার উপরে ফুলনদেবীর নামই প্রাধান্য পেয়েছে। লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মীরাট বা এই অঞ্চলের যে-কোনো শহরের চায়ের দোকান বা রাস্তার পাশে ছোট বড় হোটেলে প্রধান আলোচ্য বিষয় ফুলন দেবী। সুন্দরী দস্যুরাণী ফুলনদেবীকে নিয়ে প্রায়ই কোনো না কোনো গুজব-রটনা শোনা যায়।

কিছুদিন আগে বিশ্বস্তসূত্রে গোপন খবর পাওয়া গেল ফুলনদেবী লক্ষ্ণৌর কোনো প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত সিনেমা হলের আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে একের পর এক মহিলাদের পরীক্ষা করে দেখা হলো। সেদিন রাতে খবর রটে গেল—ফুলনদেবী ধরা পড়েছে। সারা শহরে হৈ চৈ, তুমুল সোরগোল। রাস্তার বাঁকে বাঁকে চায়ের দোকানে লোকেদের জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল।

পুলিশ সেদিন সত্যিই একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল—ফুলনদেবীর চেহারার সঙ্গে অল্পসল্প মিল আছে, মহিলা বেশে সজ্জিত এমন এক হিজড়াকে!

এ-সত্য আবিষ্কারের পরে পুলিশ হেড' কোয়ার্টারে সেদিন বড় সাহেবদের মুখগুলি যথার্থই দ্রষ্টব্য ছিল।

কিন্তু এহো বাহ্য। এখনও মাঝে মাঝে উত্তরপ্রদেশের কোনো না কোনো শহরে গুজব রটে ফুলনদেবী গ্রেপ্তারের।

ফুলন এখনও ধরা পড়ে নি। শ্রীরাম-লালারাম যেখানেই থাক—মৃত্যুভয় তাদের সর্বদা তাড়া করে ফিরছে, ফুলনের প্রতিহিংসা উন্মত্ত রূপ কেড়ে নিয়েছে তাদের চোখের ঘুম, বিস্বাদ করেছে মুখের আহার।

ফুলন ধরা না পড়লেও পুলিশের হাতে রেহাই পায় নি তার সহযোগী ডাকাত মুস্তাকীম। তার মস্তকমূল্যও ধার্য ছিল দশ হাজার টাকা। বেহমাই-ঘটনার পরে ৪ঠা মার্চ সকাল ন'টায় তার নিয়তি ঘনিয়ে আসে। ডেরাপুর থানার অন্তর্গত রাস্তাওয়া নালায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পরে তার বিনাশ ঘটে। পুলিশের গুলিতে অতিষ্ঠ হয়ে

টাকার নোট ছড়িয়ে পালাতে চেয়েছিল। পরে সব টাকা জড়ো করে দেখা যায়—দু হাজার টাকার নোট ছড়িয়েছিল সে। কিন্তু রেহাই পায় নি। পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল তার দেহ। নানা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও তার মৃতদেহ থেকে পাওয়া গিয়েছিল একটি দামী ঘড়ি আর সোনার আংটি। শোনা যায়—মৃত্যুর কিছুদিন আগে নাকি সে ফুলনকে ধরিয়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। স্পষ্টতই তার সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

ফুলন-দলের সঙ্গে আরো কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে পুলিশের।

বেহমাই ঘটনার পরে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ-বাহিনী ৩১শে মার্চ (১৯৪১ খৃ) জালাউন জেলার কাল্পি সার্কেলের অন্তর্গত সুরাউলি গ্রামকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। পালাবার রাস্তা সব বন্ধ। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনজন ডাকাত মারা যায়। কিন্তু ফুলন কোনোক্রমে তার বর্তমান প্রেমিক-সহযোগী মানসিং ও অন্যান্য কয়েকজন ডাকাতসহ নিকটবর্তী গুলালী গ্রামে পালাতে সক্ষম হয়। সংগে সংগে পুলিশও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। দ্বিতীয়বার সংঘর্ষে ফুলনের দলের আরও দু'জন ডাকাত মারা যায়।

ফুলনের ভাগ্য ভালো—সে এবং মানসিং এবারেও পুলিশের সশস্ত্র দুর্ভেদ্য জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে সব সময় রুপোর একটি দুর্গামূর্তি কাছে রাখে ফুলন।

আরও একবার ফুলনের দলের সংগে পুলিশের সংঘর্ষ হয় ২৫শে মে।

ডাকাতদলের একজন—লালারামের খুড়ীর বাড়ী দুবাই গ্রামে। ডাকাতরা সবাই দুবাই গ্রামে তখন আশ্রয় নিয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় আবার সে গ্রামে ছিল এক বিয়ের ভোজ। গ্রাম-মোড়লের কাছে গিয়ে ডাকাতরা মদ-মাংস দাবী করে। গাঁয়ের লোকেরা ডাকাতদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে। বরং চলে যেতে বলে সেখান থেকে। নয়ত পরে পুলিশ এসে নানাভাবে উত্যক্ত করবে তাদের। ডাকাতরা গ্রাম

ছেড়ে যেতে রাজী হয় না। ফলে অতি গোপনে পুলিশ খবর পেয়ে যায়।

পি-এ-সি. বাহিনীর সহায়তায় পুলিশ সমস্ত গ্রামকে সংগোপনে ঘিরে ফেলে। ডাকাতদের মোকাবিলা করতে পুলিশ এবার খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। মোষের গাড়ীতে চড়ে মাথায় পাগড়ী বেঁধে গাড়োয়ানের ছদ্মবেশে গ্রামে ঢোকে তারা। এসে প্রথমেই তারা গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উঁচু জায়গাগুলি (Strategic spots) দখল করে নেয়।

ডাকাতরা তিনটি বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিশ তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। প্রত্যুত্তরে গুলি চালায় দস্যুদল। পুলিশ বাধ্য হয়ে হ্যান্ড গ্রেনেড এবং গুলি ছুঁড়ে আক্রমণ করে। ডাকাতরা যে সব বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল তার একটিতে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। দু'জন ডাকাত সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে অন্য একটি বাড়ীর ছাদ ধসে পড়তে থাকায় সেখান থেকেও আরও দুটি দস্যু। সব কটি পুলিশের গুলিতে ধরাশায়ী। বিকেল সাড়ে চারটের সময় যখন এস. পি. শ্রী এম. ডি. মেনন ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন সে সময়ের মধ্যে আরও একজন ডাকাতকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। ষষ্ঠ ডাকাতটি বুক-ফাটা তৃষ্ণায় গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে এক বৃদ্ধার কাছে জল চাইলে সে 'বাগী' (ডাকাত) বলে চিৎকার করে ওঠে। ডাকাতটি তখন আত্মসমর্পণের ভাব দেখিয়ে গুলি চালাতে যায়। কিন্তু তার আগেই পুলিশের গুলিতে তার পাঁচ সঙ্গীর মতো তারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

নিহত এই ছ'জন ডাকাতের মধ্যে তিনজন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেহমাই গ্রামের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন বিক্রম মাল্লার ভাই রামপাল, আর অন্য দু'জন ফুল সিং ও বাবু মাল্লা।

যে সব অস্ত্রশস্ত্র পুলিশ এই সংঘর্ষের পরে ডাকাতদের কাছ থেকে পায় তার মধ্যে ছিল চারটি আমেরিকান, একটি ইতালিয়ান, এবং আর একটি দেশী বন্দুক এবং প্রচুর গোলা-গুলি।

বিকেল সাড়ে তিনটেয় শুরু হ'য়ে এই সংঘর্ষ চলেছিল রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত।

কিন্তু এ-দিনও দস্যুরাণী ফুলনদেবী ধরা পড়ে নি। ফুলনের আরাধ্য-দেবী মা দুর্গা। ফুলন নিশ্চয়ই অসংখ্যবার তার আরাধ্যা দেবীকে প্রণাম জানিয়েছে এইভাবে বারবার মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাবার জন্যে।

এর পরে আবার ফুলন সংবাদের শিরোনামায়। সে এবং মান সিং নাকি যুক্তভাবে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার কোনো একজন সদস্যকে চিঠি লিখে সদস্য মহোদয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেছে যাতে পুলিশের আক্রমণ থেকে তারা রেহাই পায়। চিঠিটি স্বভাবতই হিন্দীতে লেখা। পাওয়া গিয়েছিল নাকি পূর্বোল্লিখিত ৩১শে মার্চের পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ডাকাতদের অন্যতম লালটুর দেহ-তল্লাসীর পরে। কথিত চিঠিটির একটি ফোটোস্টাট কপিও কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অতি সঙ্গত কারণেই এই চিঠির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

শোনা যায়—এখন নাকি ফুলনের মাত্র দু'জন সহযোগী জীবিত—মানসিং আর রাম অবতার। এরা পূর্বে মূলত মুস্তাকীমের দলভুক্ত ছিল। (যদি না ইতিমধ্যে ফুলন আবার নতুন করে তার দল সংগঠন করে না থাকে।)

জনশ্রুতি—ফুলনের বর্তমান ঘনিষ্ঠ সহযোগী দস্যু মানসিংহ যাদব তার সব শেষ প্রেমিক।

আরও শোনা যায় যে—ফুলন কিছুদিন থেকে অসুস্থ এবং তার দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। ফুলনের জন্যে অসুধ নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহে পুলিশ কয়েকজন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফুলনের চারদিকে এখন পুলিশের জাল। পুলিশ বিশাল-যমুনার চারপাশে চোদ্দ মাইলের মধ্যে বর্তমান প্রেমিক মানসিংয়ের সঙ্গে সে রয়েছে।

ফুলনের এগারো বছরের ভাই শিবনারায়ণের উপর পুলিশ নজর

রেখেছে। প্রিয় এই ভাইটিকে রাখীবন্ধনের দিনে রাখী পরাতে আসে ফুলন।

ডাকাতদের গড়পড়তা বয়স ৩০। ফুলনের বয়স এখন ২৪। পুলিশের বিশ্বাস—শীগগীরই তার ডাকাত-জীবনের অবসান ঘটবে।

পুলিশের দৈনন্দিন অন্যান্য কাজকর্মের চেয়ে ফুলনকে গ্রেপ্তার করাই তাদের প্রধান করণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যাক—কবে ফুলন ধরা পড়ে।

—সাত—

অনেকে ফুলনকে দানবী রূপে বর্ণনা করেছেন। সমস্ত নারী ডাকাতদের মধ্যে সে ভয়ঙ্করী। তার মনে নাকি বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই। পুলিশের মুখোমুখি সংগ্রামে সে উচ্চগ্রামযন্ত্রের সাহায্যে পুলিশকে অকথ্য গালি-গালাজ দেয়, সে নাকি তার দলের ডাকাতদের উৎসাহ দেয় তার সামনেই অসহায় মেয়েদের ধর্ষণ করতে। ধর্ষিতা রমনীরা যখন যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে তখন সে বিকৃত আনন্দে হাততালি দেয়।

দস্যুরাণী পুতলী বাঈয়ের সঙ্গে অনেক মিল ফুলন দেবীর। পুতলী বাঈয়ের পরে ফুলনদেবীই নারী-ডাকাতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম। কাহিনী-জনশ্রুতিতেই মাত্র নয়—পুতলী বাঈয়ের জীবন-অবলম্বনে ফিল্ম হয়েছে, ফুলনদেবীকে নিয়ে নির্মীয়মান।

পুতলবাঈ এবং ফুলনদেবী দু'জনেই প্রথমে ছিল দস্যু-নেতার রক্ষিতা। প্রেমিক ডাকাত-নেতা নিহত হবার পরে তারা ডাকাতদলের নেতৃত্ব দিয়েছে।

পুতলী বাঈয়ের মতো ফুলন দেবীও অসম সাহসিকা এবং অতিশয় নিপুণা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায়।

ফুলনের হয়ত ইচ্ছে ছিল সেও পুতলী বাঈয়ের সমপর্যায়ে পেঁছবে। কিন্তু কিছু কিছু মিল থাকলেও ফুলনদেবী কখনও পুতলী বাঈয়ের কাছে পেঁছতে পারবে না।

পুতলী তার একটি মাত্র হাত নিয়ে অসীম শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়ে গেছে। ডাকাত হলেও পুতলীর মধ্যে ছিল রমনীর সহজাত সমবেদনা, করুণা ও স্নেহভাব। পুতলীর অসীম অপত্য স্নেহ ছিল তার মেয়ে তন্নো এবং হারিয়ে-যাওয়া ছেলে সুরেন্দ্রর প্রতি। সর্বোপরি তার ছিল এক ধরনের নৈতিকবোধ।

অনেক ওয়াকিবহাল সাংবাদিকের মতে ফুলনের মধ্যে ঐ সব সদ্‌গুণের লেশমাত্র নেই। তার অন্তরে কেবল প্রতিহিংসা-স্পৃহা ও অন্তহীন নিষ্ঠুরতা।

ফুলনের দলের যে-সব ডাকাত ধরা পড়েছে তাদের বয়ানে জানা যায় যে—দলের লোকের সামনেই ফুলন কাপড় খুলে স্নান করত—দলের অন্য সবাই যেন মানুষই নয়। দলের অন্য মেয়েরা কিন্তু গাছ বা ঝোপের আড়ালে গিয়ে নাইত। ফুলন সে সবের ধার ধারে না।

তারা আরও বলে যে-ফুলনের মুখে অশ্রাব্য খিস্তির খৈ ফোটে।

ফুলনের প্রথম প্রেমিক কৈলাশ কিন্তু বলে যে তার সঙ্গে ফুলন যখন ছিল তখন সে কখনও খারাপ কথা বলত না।

প্রাক্-দস্যুজীবন এবং দস্যু-উত্তর জীবনের মধ্যে অনেক তফাৎ।

জানা যায় যে—ফুলন একটি রাবারষ্ট্যাম্প বানিয়েছে যা সে 'লেটার হেড' হিসেবে ব্যবহার করে। এতে রয়েছে—

"দস্যু সুন্দরী

দস্যু-সম্রাট বিক্রম সিং-কা প্রেমিকা।"

পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জেনারেলকে ফুলন যেসব চিঠি লিখেছে তা একদিকে যেমন দেবী দুর্গামাতার প্রতি ভক্তিভাব এবং অন্যদিকে তেমনি লৌকিক অশ্লীল কথায় পূর্ণ।

একটি চিঠি সে "জয় দুর্গা মাতা" বলে শুরু করেছে। তার নীচে ফুলনের রাবারষ্ট্যাম্পের ছাপ। সম্বোধন—"মহামান্য ইন্‌সপেক্টর জেনারেল সাহেব'···আপনি আমাদের শুয়োরের মতো গুলি করে মারবার হুমকি দিয়েছেন। আমি আপনাকে ঐ সব 'বকোয়াস' (আজেবাজে কথা)

বন্ধ করবার জন্যে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। নয়ত আপনার সম্মানিত গর্ভধারিনীকে আমার দলের লোকেরা এমনভাবে অত্যাচার করবে যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। অতএব সাবধান—"

যা-ই হোক, ফুলনের সঠিক রূপায়ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। একদিকে অনেক পত্র-পত্রিকা যেমন তাকে নিয়ে রোম্যাণ্টিক গালগল্প বানিয়ে অতিরঞ্জিত করে ছেপে হিন্দী ফিল্মের 'নায়িকা' বানিয়েছে, অনেকে আবার ফুলনের উপর অতিরিক্ত কালিমা লেপন করে দানবীর রূপ দিয়েছে। তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, কারণ যা-ই থাক না কেন, ফুলন অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির জীবনহানির জন্যে দায়ী।

প্রথম থেকে ফুলনের জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে—বালিকা বয়সে তার চেয়ে তিনগুণ বড় এক কঠোর ও ক্রূর ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের পর থেকে তার জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-যন্ত্রণার। অন্য মেয়ের মতো তার মনেও ছিল সহজাত ঘর বাঁধবার আকাঙ্খা, স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসা এবং স্বাভাবিক দেহ-উপভোগের বাসনা। কিন্তু পরিবর্তে তার ভাগ্যে জুটেছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও শারীরিক অত্যাচার।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক নারী সমাজ-সংসার থেকে পেয়েছে শুধু নিপীড়ন ও নিগ্রহ।

ছেলেবেলা থেকেই ফুলনের স্বভাব একটু চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চল হলেই সে-মেয়ে ডাকাত হয় না।

ফুলনের ছোটবোন রামকলি বলেছে—ফুলনকে ডাকাত বানিয়েছে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও মানুষের অত্যাচার। ফুলনের মায়ের মতে—পুলিশের নিগ্রহ।

প্রমথবার যখন ডাকাতির মামলায় ফুলনকে জড়িয়ে দেওয়া হলো এবং ফলে তিন মাস সে লোহার গরাদের পেছনে কাটিয়ে এলো—ফুলনের জীবনে এই ঘটনাই সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন এনেছে, বদলে দিয়েছে তার জীবনের ধারা। আমাদের দেশে কয়েদখানায় মেয়ে-অপরাধীদের জীবন

কিভাবে কাটে—তা সমাজতাত্ত্বিকদের আকর্ষনীয় আলোচ্য বিষয়। ফুলনের যে আত্মীয় তাকে বিনা দোষে ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দিয়েছিল, ডাকাত হয়ে ফুলন সেই আত্মীয়ের বাড়ীতেই প্রথম দস্যুবৃত্তি করে।

পারিপার্শ্বিক অত্যাচার নিপীড়ন ফুলনের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে যে ভয়ঙ্করী জীবন আতঙ্ক তার নাম দস্যুরাণী ফুলনদেবী।

অল্পবিস্তর এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাব নারী-ডাকাত জনকশ্রী, কাপুরী, সুমন শর্মা, মুন্নী বাঈ ইত্যাদির জীবনে।

খবরের কাগজের লোক, ফোটোগ্রাফার, বিভিন্ন সাংবাদিকদের আনাগোনায় ফুলনের বৃদ্ধা মা মুলি-ও এখন 'পাব্লিসিটি' সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেছে। সে বলে—"জীবনের শানদার (গৌরবময়) এক ঘণ্টাও এক ঘেয়ে এক যুগের চেয়ে দামী।"

ফোটোগ্রাফাররা এসে ফোটো তুলতে চাইলে বৃদ্ধা মুলি এখন তার রুপোর গহনা সব পরে নেয়, নখে রঙ লাগায়।

সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ফুলনের পরের বোন রামকলি —যার মধ্যে ফুলনের প্রতিচ্ছবি। রামকলির চেয়ে ফুলন দেখতে সুন্দর।

রামকলির দীঘল চোখ, সরু কোমর, ভারী বুক ও গভীর নিতম্ব। ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে রুজ আর নখে রঙ লাগিয়ে ফিল্ম ষ্টারের ভঙ্গীতে 'পোজ' দেয় সে। বঙ্কিম কটাক্ষে মনোরমা রামকলি বলে—"শহরের বাবুরা এসে সবাই আমার ছবি তুলতে চায়।"

ফুলন সম্বন্ধে তার মন্তব্য—"আমরাই ওর দেখা পাই না তো পুলিশ ওকে কি করে ধরবে? ওকে ধরা কি এতই সহজ?"

কিন্তু ফুলন রক্ত-মাংসের মানুষ, সে হাওয়ায় মিশে থাকতে পারে না।

॥ সব শেষ খবর ॥

ফুলনের আর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী রঘুনাথ মাল্লা (২৬) ভোগ্নিপুর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা গেছে। খবরটি দিয়েছেন কানপুরের এস. পি. শ্রী এম. ডি. মেনন (৮. ২. ৪২)।

রঘুনাথকে গ্রেপ্তারের জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। দলের ১২ জন ডাকাত নিয়ে রঘুনাথ এ-পর্যন্ত ৪০টি নরহত্যা ও ডাকাতিতে অভিযুক্ত।

জালাউন, হামিরপুর, এটোয়া, হানসি এবং কানপুরে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দস্যুবৃত্তি চালিয়ে গেছে রঘুনাথ।

তার ছ'জন সহযোগী আগেই নিহত হয়েছিল। পুলিশের কাছ থেকে চুরি করা একটি ·৩০৩ রাইফেল ছাড়াও পুলিশ আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে রঘুনাথের কাছ থেকে।

এখন ফুলনের সঙ্গে রয়েছে তার প্রেমিক মান সিং ছাড়া অন্য অনুগামী-দের মধ্যে বিষ্ণুমণি রাম এবং রামসেবক।

জালাউন জেলার মীরাপুর গ্রামের দুটি বাড়ীতে হানা দিয়ে ফুলনের দল একটি রাইফেল এবং একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে গত ১৪ এপ্রিল (১৯৪২ খৃ)।

এর দু'দিন পরেই (১৭ এপ্রিল) ফুলনকে আশ্রয় ও আহার দেবার জন্যে হামিরপুর জেলার উয়াতোরি গ্রামের একজন চৌকিদার এবং এক জন কামারকে গেপ্তার করেছে পুলিশ ; হামিরপুর আর জালাউন জেলার প্রায় পঞ্চাশজন নারী ও পুরুষকেও পাকড়াও করে নিয়ে গেছে ঐ একই অপরাধে।

মে-মাসের শেষের দিকে (২৪. ৫. ৪২) পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে ফুলনের ৫৫ বৎসর বয়স্কা মা মুলা দেবীকেও। মুলা নাকি সংগোপনে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিল ফুলনের সঙ্গে।

এর পাঁচদিন পরে (৩০ মে) গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ হানা দিয়েছিল কানপুরের এক গুপ্ত আড্ডায়। কিন্তু এবারেও ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। ফুলন আগেই হাওয়া।

কিন্তু ফুলন কতোদিন থাকবে অ-ধরা ?

ফুলন তো যে-কোনো দিন ধরা পড়তে পারে। হয়তো আমার এ-লেখা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে তার আগেও। ধরা পড়লে তার কী শাস্তি হবে ? মহাত্মা গান্ধী এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রদর্শিত পথের আলোকে ? অথবা, অন্য আর পাঁচটা অপরাধীর মতো ? আইন তো তার বিধিবদ্ধ পথেই চলবে।

ফুলনের সম্বন্ধে এস. পি শ্রী বিজয়শঙ্কর যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : আমি ফুলনকে মারতে চাই না। আমি ফুলনকে শুধু একটা ডাকাত হিসেবে দেখি না। বরং ওকে মনে হয় বিপথগামী এক শিশু। আমি ফুলনকে ধরব এবং ওকে ঠিক পথে প্রতিষ্ঠা করব।'

—একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে ফুলনের ভাগ্য তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পর্ব

মেয়েরা কেন ডাকাত হয়

১. কুন্তলা

২. জনকশ্রী

৩. কপ্পুরী

৪. হাসিনা

৫. রামকলি

৬. সুমন শর্মা

৭. মীরা ঠাকুর (এক)

মীরা ঠাকুর (দুই)

৮. আরো কয়েকজন নারী ডাকাত

(কমলা, রোডি,রূপবতী

মুন্নীবাঈ)

১

॥ কুসুমা ॥

জানি, ইতিহাসের পাতায় এদের ঠাঁই হবে না, তবু সরকারী নথি-পত্রে বিশ শতকের সাতের দশক, আরো বহু ঘটনার সঙ্গে, অনেক নারী ডাকাতের আবির্ভাবে উল্লেখনীয়।

এদের বিচরণ ক্ষেত্র বিশেষভাবে মধ্যপ্রদেশ-উত্তরপ্রদেশ রাজস্থানের দুর্গম জল-জঙ্গল পাহাড়ী ঘাটি-খাদ-অরণ্য অঞ্চল।

পুরুষ-ডাকাতদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্রে প্রথম দিকের নারী-ডাকাতদের মধ্যে রয়েছে বেগম বশীরা (১৯৪০ খৃ.)। তার দু' দশক পরে চম্বল ভ্যালিতে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল পুতলী বাঈ।

পুতলী বাঈয়ের পরে নাম করতে হয় বিজলীর। কিন্তু নিজ নামের মতোই সংক্ষিপ্ত বিজলীর দস্যু-জীবন। বিদ্যুচ্চমকের মতোই দশদিনের মধ্যে তার দস্যু-জীবনের সমাপ্তি। পুলিশকে একটি গুলিও খরচ করতে হয়নি তাকে ধরবার জন্যে।

এরপরে সাতের দশকে বহু নারী ডাকাতের আবির্ভাব। ফুলন দেবীর কথা আগের অধ্যায়ে বর্ণিত। আরও কয়েক জনের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে। বুদ্ধিমত্তা, হিংস্রতা ও অস্ত্র চালনায় তারা ফুলনের চেয়ে কম যায় না।

এই ডাকাতদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের, দু-একজন মাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের। নারী-ডাকাতদের অনেকেই দস্যুবৃত্তির পথে তাড়িত হয়েছে অশান্তিময় বিবাহিত জীবনে স্বামী ও অন্যান্যদের অত্যাচারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনই তাদের ডাকাত হবার মূলে। দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অভিশাপ সেই সঙ্গে এদের

জীবন বিষময় ক'রে দিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে অপরাধের অন্ধ গলিতে, বিপর্যস্ত হয়েছে জীবনের সুস্থ ভিত্তি।

এই ডাকাতদের অনিবার্য পরিনাম পুলিশের সংগে সশস্ত্র সংগ্রামে বিনাশ, অথবা কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী জীবন।

ফুলনদেবীর মতো এই নারী-ডাকাতের নামটি খুব সুন্দর—কুন্তলা, আর হিংস্রতায় কুন্তলাও ফুলনের সমপর্যায়ে।

কুন্তলার ভয়াবহ খপ্পর থেকে যে দু'-একজন বন্দী কোনো ভাবে ভাগ্যক্রমে বেঁচে এসেছে তাদের বর্ণনায় জানা যায় যে কুন্তলারও প্রিয়। হিন্দী ফিল্মের 'ছোড় দিয়া যায়ে কি মার দিয়া যায়' গানটি। বন্দুকের গুলির শব্দ কুন্তলার কানে মধুবর্ষণ করে, ডাকাতির অভিযানে তার দেহে আনন্দের শিহরণ, রক্তাক্ত সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিবেশে তার মনে পুলকের সৃষ্টি হয়, সে গেয়ে ওঠে—'মেরা নাম হ্যায় চামেলি, ম্যয় হুঁ ডাকু আলবেলি।'

গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হলেও কুন্তলার শরীর সুদৃঢ়। উত্তরপ্রদেশের অন্যতম জেলা ফরুখাবাদ। এই জেলার হাথাউরা গ্রামে তার জন্ম। বাবার নাম হাজারি যাটব। হাজারি নিজেও ছিল দুষ্প্রকৃতির, গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই সে মারপিট করত, গ্রামবাসী তার অত্যাচারে অস্থির। চোর-ডাকাত পালিয়ে এসে তার বাড়ীতে আশ্রয় পেত।

সে-সময়ে চম্বল ভ্যালির কুখ্যাত ডাকাত ছিল রাম সনেহি। তাকে ধরবার জন্যে পুলিশ রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাম সনেহিকে জীবিত বা মৃত ধরবার জন্যে সরকার দু' হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন। রাম সনেহির সঙ্গে হাজারির বেশ দোস্তি ছিল। সে প্রায়ই হাজারির বাড়ীতে এসে থাকত।

বাড়ীতে ডাকাতদের আনাগোনা, পিতা হাজারির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা বালিকা বয়স থেকেই কুন্তলার মনে ছাপ ফেলেছিল। অন্য মেয়েরা যখন পুতুল নিয়ে খেলত, কুন্তলা নাড়াচাড়া করত ঘরে-রাখা

বন্দুক নিয়ে। সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে দুর্দান্ত ছেলেদের সঙ্গে তার ভাব ও মেলামেশা ছিল বেশী। ডাকাতরা এসে হাজারির সঙ্গে যখন দস্যুবৃত্তির নানা কথা—পরিকল্পনা আলোচনা করত পাশের ঘরে বসে কুন্তলা কান লাগিয়ে তা শুনত, তার শরীরে এক রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগত। এভাবে বালিকা বয়স থেকেই পরিবারের দূষিত পরিবেশে তার মন বিষিয়ে উঠতে থাকে। সে হয়ে ওঠে বাপ-কা-বেটি!

ডাকাত রাম সনেহির সঙ্গে তখন হাজারির গভীর হৃদ্যতা। হাজারির ঘরে তাদের প্রধান আড্ডা। ডাকাতদের সঙ্গে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে হাজারি। রাতে ডাকাতরা আসে, খায়, থাকে, ডাকাতির পরিকল্পনা করে, দস্যুবৃত্তিতে বার হয় এবং ডাকাতির শেষে আবার ফিরে আসে।

বালিকা কুন্তলা আস্তে আস্তে যুবতী হয়ে ওঠে। সেদিন রাতে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছে সে। তার দরজায় কার করাঘাত। করাঘাত জোরদার হয়ে উঠলে কুন্তলার ঘুম ভেঙ্গে যায়। খাটিয়ায় উঠে বসে সে, তারপর পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ খিল খুলে দিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়ায়। কাউকে সে দেখতে পায় না। তার মনে সন্দেহ জাগে, ঘর থেকে একটা কুড়োল নিয়ে আবার পিছন ফিরে আসতেই এবার সে বলিষ্ঠ গঠন, লম্বা মোচড়ানো গোঁফধারী এক ব্যক্তিকে দেখতে পায়, সহসা যেন শূন্য থেকেই নিঃশব্দে এই ব্যক্তির আবির্ভাব। তারা পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। লোকটির কাঁধে ঝোলানো দোনালা বন্দুক দেখে কুন্তলার মনে একটুও ভয় হয় না। বরং অন্তর্নিহিত শক্তির বলে সে তার হাতের কুড়োলের কোপ বসাতে যায় নিশীথ-আগন্তুকের গলায়। লোকটি অতি অনায়াসে তার কুড়োলের আঘাত থেকে সরে দাঁড়ায় এবং তারপর কুন্তলার হাত থেকে কুড়োলটি ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার কব্জি চেপে ধরে।

নিঃশব্দে কুন্তলার ভাগ্য বদলে যায়!

রাতের আগন্তুক কুখ্যাত দস্যু রাম সনেহি ছাড়া আর কেউ নয় তখন তার বয়স ৩৮। কুন্তলা ফুল্ল যুবতী।

কিন্তু হাজারি যাটবের মধ্যে পিতৃত্ব জেগে ওঠে। ডাকাত রাম সনেহি কাহারের সংগে সে নিজের মেয়ে কুন্তলার বিয়ে দিতে রাজী হয় না—যতই না তার ভাব থাক রাম সনেহির সঙ্গে। হাজারি তাড়াতাড়ি চুপিচুপি গাঁয়ের রাজেন্দ্র যাটবের সঙ্গে কুন্তলার বিয়ে দিয়ে দেয়। রাম সনেহির সঙ্গে কুন্তলার মেলামেশা তার একদম পছন্দ ছিল না।

রাম সনেহি তখন কুন্তলার আকর্ষণে উন্মাদ। কুন্তলার শ্বশুর বাড়ীতে এসে সে গোপনে নববধূর সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। কুন্তলার শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের এটা একদম ভালো লাগল না। গাঁয়ে তাদের একটা ইজ্জৎ আছে। ঘরের বউয়ের সংগে একটা দুর্দান্ত দুশ্চরিত্র দস্যুর দেখাশোনা কারই বা ভালো লাগবে?

ডাকাত রাম সনেহি এই সব কিছুর পরোয়া করে না। কুন্তলার আকর্ষণ বার বার তাকে নিয়ে আসে। ফলে কুন্তলার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ঠিকই করে ফেলল যে—রাজেন্দ্র তার বউকে 'তালাক' দিয়ে দেবে, রাম সনেহির মতো একটা কুখ্যাত দস্যুর সঙ্গে তো তারা আর লড়তে পারবে না। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের আগে গাঁয়ের লোকেদের সামনে কুন্তলাকে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা চরম অপমান আর লাঞ্ছনা করল। মেয়ে বলে তার কিছুমাত্র মর্যাদা দিল না তারা।

এই ঘটনার পরে রাম সনেহির সঙ্গে যোগ দিতে কুন্তলার আর দেরী হয় না। রাম সনেহির সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু ডাকাতিতে সে অংশ গ্রহণ করল, অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিল, রক্তাক্ত মৃতপ্রায় বলির সামনে সে আনন্দে বন্দুক নিয়ে নেচে নেচে গাইতে লাগল—'মেরা নাম চামেলি—'

কারো প্রতি সন্দেহ হলে কুন্তলা তাকে জীবন্ত ছেড়ে দিত না। তার প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়েছে তার আত্মীয়-স্বজনও।

রাম সনেহির প্রতি কুন্তলার আন্তরিক টান ছিল। এই প্রেমিক-ডাকাত রাম সনেহিকে বাঁচাতে গিয়েই পুলিশের গুলিতে সে প্রাণ হারায় (১৯ অক্টোবর, ১৯৪৫ খৃঃ)। শেষ হয় এক নারী-ডাকাতের আতঙ্ক—

যার নাম ছিল কুন্তলা ; কুশিক্ষা, পরিবেশ আর পরিস্থিতি সুস্থ সংসার জীবনের সীমা থেকে যাকে বিতাড়িত করেছিল দস্যুবৃত্তির পথে।

রাম সনেহিও কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাত থেকে রেহাই পায় নি। ১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তার জীবনান্ত হয়।

২

॥ জনকশ্রী ॥

আর একটি সুন্দর নাম। জনকশ্রী। কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি স্নিগ্ধ নামের এই সুশীলা মেয়েটি একদিন ডাকাত হয়ে যাবে।

জনকশ্রীর ডাকাত হবার মূলে দায়ী তার স্বামীর অবহেলা, শ্বশুর-বাড়ীর অত্যাচার এবং শ্বশুরের সংগে দস্যু নাহার সিংহের বিবাদ। সামাজিক পরিবেশ আর পারিবারিক কলহ সুস্থ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন থেকে বঞ্চিত করে জনকশ্রীকে ছুঁড়ে দিয়েছে অপরাধের অসামাজিক জগতে। জনকশ্রীর জীবন-কাহিনী কারুণ্যময়।

আগ্রার কাছে পাতিপুর গ্রামে জনকশ্রীর জন্ম। বিবাহের পরে অন্য মেয়েদের মতো সে-ও স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে এসে তার সে স্বপ্ন ভেংগে খান্ খান্ হয়ে যেতে লাগল। স্বামীর অবহেলা ছাড়াও শ্বশুরের অত্যাচার ছিল অসহনীয়। তাও সব কিছু সে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিয়তি তাকে অন্য পথে নিয়ে গেল।

বিয়ের পরে তার একটি মেয়ে হয়েছিল। মেয়ের ন' বছর বয়স হলে রাজখেড়া থানার অন্তর্গত কানহা গ্রামের হোলিরছেলে মুরারির সংগে তার বিয়ে দিতে সচেষ্ট হলো জনকশ্রী। মুরারির সংগে ডাকাত নাহার সিংহের আত্মীয়তা ছিল। তাই এই বিয়েতে জনকশ্রীর শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের একদম মত ছিল না। ফলে এই বিবাহ-প্রস্তাব জনকশ্রীর জীবনে লাঞ্ছনার বোঝাই বয়ে আনল।

নাহার সিংয়ের সংগে জনকশ্রীর শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের খুব শত্রুতা ছিল। তার শ্বশুরের চেষ্টায় নাহার সিংয়ের একবার কারাবাস ঘটেছিল।

ফলে নাহার সিং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ফুঁসছিল। আর এই দুপক্ষের বিবাদের বলি হলো জনকশ্রী।

শ্বশুরের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় জনকশ্রী একদিন ঝগড়া করে তার সব সোনার গহনা নিয়ে বাপের বাড়ীতে যাচ্ছিল। নাহার সিং এবার তার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেল—সে রাস্তা থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেল জনকশ্রীকে।

ফুলন বা কুন্তলার মতো দস্যু-জীবনের প্রতি তার কোন আকর্ষণ ছিল না। নাহার সিংয়ের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু নাহার সিং তাকে ছাড়ল না। বরং মার-ধোর ক'রে, বন্দুকের নল তাক করে তাকে নাচতে-গাইতে বলত। নিপীড়ন—লাঞ্ছনা অত্যাচারে চীৎকার করে কাঁদত জনকশ্রী, কিন্তু দস্যুর পাশবিক অত্যাচার থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পেত না। সে আশা করত—তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা পুলিশের সাহায্যে একদিন তাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু বৃথাই তার মুক্তির স্বপ্ন। সে জানত না যে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা চিরদিনের জন্যেই তাকে বিসর্জন দিয়েছে। তাই জনকশ্রীর অবিরাম কাতর আর্তনাদ আর করুণ কান্নায় অতিষ্ঠ হয়ে নাহার সিং একদিন যখন তাকে ফিরিয়ে দিতে গেল তার শ্বশুরবাড়ীতে তারা জনকশ্রীকে আর ফিরিয়ে নিল না। সে-বাড়ীর দরজা চিরদিনের জন্যেই তার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর নাহার সিংয়ের দাসীত্ব করে সেই নরকে দিন গুজরান করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না জনকশ্রীর।

এই ঘটনার পরে নাহার সিং নাকি তাকে বিয়ে করেছিল। তাকে শিক্ষিত করে তুলেছিল আগ্নেয়াস্ত্র চালনায়, দিয়েছিল দস্যুবৃত্তির তালিম। নাহার সিংয়ের দলের লোকেরাও তাকে সর্দার-পত্নীর সম্মান দিয়েছিল। দস্যু-বৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল সে।

এরপর অনেক টাকাপয়সা ও জিনিষপত্র যৌতুক দিয়ে জনকশ্রী তার মেয়ের বিয়ে দেয়।

পুলিশের তাড়া খেয়ে তাদের ভয়ে নাহার সিং ফতেগড় জেলায় তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল সেই সময়। সেখানে গিয়ে নাম বদলে 'অমর সিং' হলো সে আর জনকশ্রী, 'মুন্নি'।

সেই সময় একদিন গাঁয়ের পাতকুয়োর কাছে 'অমর সিং' বিশ্রাম করছিল আর 'মুন্নি' কাছেই একটা গাছের ছায়ায় শুয়েছিল। একটি গ্রাম্য দম্পতির পরিপূর্ণ সুখের ছবি। হঠাৎ জনাছয় লোক কোত্থেকে এসে তাদের ঘিরে ধরল। তাদের একজন শান্ত স্বরে জনকশ্রীর নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। মুখের উপর পুরো ঘোমটা টেনে সে উত্তর দিল যে তার নাম মুন্নি, মথুরা থেকে এসেছে।

মথুরার কথা শুনে সেই লোকেদের একজনের সন্দেহ হলো। তার বাড়ী ছিল মথুরায়। জনকশ্রীর কথায় আগ্রার ব্রজভাষার টান, মথুরার নয়। মুখের বুলিই জনকশ্রীর বিপদ ডেকে আনল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের সেই ১৯শে সেপ্টেম্বর সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল নাহার সিংয়ের সংগে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জনকশ্রী বলে যে—যখন ডাকাতরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন সে ছিল সাদাসিধে এক সরল মেয়ে। কিন্তু তারপর ডাকাতদের সংসর্গে তার জীবন পুরো বদলে গিয়েছে। সে বন্দুক চালাতে শিখেছে, আসক্ত হয়েছে মাদক পানীয়ে, রপ্ত হয়েছে মানুষ খুন করতে।

জনকশ্রী তার অতীতের শান্ত সরল বিবাহিত জীবনের সেই বধূরূপকে একদম ভুলে গেছে। এখন সে নাহার সিংয়ের প্রতি অনুরক্ত। ডাকাতির জীবনে অবশ্য ফিরে যাবার ইচ্ছে তার নেই। তবে নাহার সিং যে হুকুম দেবে, মুক্তিলাভের পরে, সেই জীবনযাত্রাকেই সে বেছে নেবে।

তার জীবনে পিছন ফিরে দেখবার আর কিছু কি বাকী আছে?

৩

॥ কপুরী ॥

অসুখী দাম্পত্যজীবন আরা কারাবাসের কঠোর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে কপুরীকে ডাকাতী জীবনে ঠেলে দিয়েছিল।

ঠাকুর সম্প্রদায়ের এক পরিবারে কপুরীর জন্ম। যুবতী বয়সে তার চেয়ে বয়সে দ্বিগুন প্রায়-বৃদ্ধ এক ব্যক্তির সংগে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

অক্ষম পতির সংসর্গে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলে এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে নিজ পছন্দ মতো খড়্গা সিং ওরকে খড়্গা নামে এক দুর্ধর্ষ পুরুষের সংগে সে বাস করতে থাকে।

খড়্গাসিংয়ের জীবন যাপন পদ্ধতি অবিশ্যি সন্দেহাতীত ছিল না। অতি কুখ্যাত দস্যুসর্দার মাধো সিংয়ের দলভুক্ত সন্দেহে পুলিশ একবার তাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রমাণাভাবে পরে সে মুক্তি পায়।

পুলিশ তার পিছু ছাড়ে না। কিছুদিন পরে আবার তারা তার বাড়ীতে হানা দেয়। কিন্তু এবারে আর তাকে ধরতে পারে না। পুলিশ খড়্গাসিংয়ের বদলে কপুরীকে ধরে নিয়ে যায়।

জেল থেকে কিছুদিন পরে কপুরী মুক্তি পায়। কিন্তু এই কারাবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা তার মনে পুলিশের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার সৃষ্টি করে। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এবার সে চম্বল ভ্যালিতে খড়্গাসিংয়ের সংগে যোগ দেয়। পূর্ণ দস্যুবৃত্তিতে দীক্ষা হয় তার।

সৌভাগ্যক্রমে কপুরীর দস্যুজীবন দীর্ঘ নয়, দেড়-দু বছরের মধ্যেই তার ডাকাত-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জয়প্রকাশনারায়ণ আদর্শের আলোকে সরকারের মহানুভূতি পূর্ণ আহ্বানে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল আরো অনেক ডাকাতের

সংগে কপ্রুরীও আত্মসমর্পন করে। এই সময় সে গর্ভে সন্তান বহন করছিল। আত্মসমর্পনের পরে তার একটি সন্তান হয়।

কপ্রুরীর কামনা—তার সন্তান স্বাধীন ভারতের সুস্থ স্বাভাবিক নাগরিক হয়ে মানুষ হবে—অপরাধী ডাকাত হয়ে নয়। তার জীবনে যে-বিপর্যয় ঘটে গেছে তা তার সংগেই শেষ হয়ে যাক।

সবাই আশা করবে—কপ্রুরীর আকাঙ্ক্ষা সফল হোক। তার জীবনের কলঙ্কের দাগ যেন তার সন্তানকে স্পর্শ না করে।

৪

॥ হাসিনা ॥

নামের মতোই সুন্দরী আর এক তরুনী ডাকাত হাসিনা। দস্যুবৃত্তির অসামাজিক পথ বেছে না নিলে হাসিনার রূপ তাকে চলচ্চিত্রেব নায়িকা বানাতে পারত।

গৌরাংগী হাসিনার ছিল ভরন্ত মুখশ্রী, ফুল্ল দেহ বল্লরী, পীবর স্তন। প্রথম দৃষ্টিতেই লোকেরা তার প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করত।

ছাব্বিশ বছরের এই সুঠাম তন্বী নারী-ডাকাতের দস্যু জীবন একেবারেই দীর্ঘ নয়, মাত্র মাস আস্টেক।

উল্লেখনীয় বিষয়—রূপবতী হাসিনা কিন্তু জীবিত অবস্থায় ততটা 'খ্যাতি' লাভ করেনি যতটা করেছিল তার শোচনীয় মৃত্যুর পরে (মে, ১৯৪৮)।

হাসিনা ছিল যেমনই রূপসী তেমনই নিষ্ঠুর। যেখানে সে হামলা করত, বিশেষ ক'রে সেখানকার যুবতী রমনীদের সে নানাভাবে নির্যাতন করত। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের ললিতপুর, ছতরপুর প্রভৃতি সীমান্ত জেলাগুলিতে তার স্বল্পকালীন দস্যু জীবনে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল।

মধ্যপ্রদেশের টিকমগড় অঞ্চলের বড়াগাঁও গ্রামে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে এক গরীব মুসলমান পরিবারে তার জন্ম। বাবা রমজানের মৃত্যু হয় তার জন্মের কিছুদিন পরেই। বিধবা মাকে অতিকষ্টে সংসার চালাতে হতো। দরিদ্র অসহায় বিধবাদের দেহ সম্বল করে যেভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় হাসিনার মা সে-জীবনের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিল। মেয়ের প্রতি তার তেমন দৃষ্টি ছিল না। ফলে হাসিনা বড় হয়ে ওঠে

তার মামার তত্ত্বাবধানে অবহেলায় অনাদরে। চৌদ্দ বছর বয়সে মামা দাস খাঁ তার শাদি দিয়ে দেয় উত্তরপ্রদেশের ললিতপুর জেলার মৌরাণী পুর গ্রামের বাবু খাঁ নামে এক মুসলমান যুবকের সংগে। কিন্তু হাসিনা নিজের রূপ ও দৈহিক আকর্ষণ সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিল। তার উদ্ভিন্নযৌবন শরীরে রূপমুগ্ধ লোকেদের দৃষ্টিলেহন সে অনুভব করত এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সে-দুর্বলতাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে লাগাত। বউয়ের এই আচরণ তার স্বামীর ভালো লাগল না। ফলে বছর দুয়েকের মধ্যেই এ বিয়ে ভেংগে যায়। স্বামী-পরিত্যক্তা হাসিনা আবার মামার বাড়ীতে ফিরে আসে।

হাসিনার বয়স তখন চব্বিশ। পূর্ণ যুবতী। আগুনের মতো রূপ শরীরের বাঁকে বাঁকে চমকাচ্ছে। তার মনে রাজকুমারের স্বপ্ন। কিন্তু হায়, তার মামা আবার তার বিয়ে দিল সালীম খাঁ নামে এক গরীব মজুরের সংগে। স্বপ্নভংগ আর কাকে বলে!

দরিদ্র স্বামীর ঘরে এসে অভাব-অনটনে হাসিনার দেহ মন ছটফট করতে থাকে। এই স্বাসরুদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে হাঁসফাঁস করে।

এই সময় সুপুরুষ সুদর্শন এক ট্রাক-ড্রাইভারের সঙ্গে তার দেখা হয়। নাম খিলায়ন সিং। ট্রাক মেরামতের জন্যে তাদের গ্রামে এসেছিল। খিলায়ন লিখতে পড়তে জানত। হাসিনা যেন এতদিনে তার মনের মানুষ খুঁজে পেল।

তাদের গ্রামে খিলাওনের আসা-যাওয়া বেড়ে গেল। স্বামী সলীম খাঁয়ের আপত্তি সত্বেও এই প্রেমিক-যুগলের মেলামেশা চলতে লাগল মাসের পর মাস। ফলে এদের দুজনাকে নিয়ে লোকমুখে নানারকম কুৎসা রটতে লাগল।

চম্বলের ডাকাতদের সংগে সক্রিয় যোগাযোগ ছিল খিলাওনের। ডাকাতিতে তার হাতখড়ি আগেই হয়ে গেছে। লোকের নিন্দায় হাসিনার সঙ্গে মিলন যখন কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন খিলাওন তার দুই

দুষ্কৃতিকারী সঙ্গী গোপাল ও নোনেজুর সহায়তায় হাসিনাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আশ্রয়ের সন্ধানে খিলাওন সিং এবার হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে অপরাধের জগতে পা বাড়াল। রূপসী হাসিনার যৌবনশ্রীতে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিভ্রান্ত যুবক তাদের সঙ্গে যোগ দিল, ফলে আস্তে আস্তে হাসিনা হয়ে উঠল দুর্ধর্ষ এক ডাকাতদলের নেত্রী। উত্তর প্রদেশের ললিতপুর আর মধ্যপ্রদেশের চারটি জেলা—সাগর, টিকমগড়, গুণা এবং শিবপুরীতে হাসিনার দল আটমাস ধরে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের অভিযোগ—এই সময়ে তারা বারোটি ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করে। তাদের বিরুদ্ধে অবিশ্যি হত্যার কোনো অভিযোগ ছিল না।

ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ শহরেও হাসিনার উপস্থিতি অনুভব করা গেল যখন তার দল কানপুরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলেকে মুক্তিপণের দাবীতে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

হাসিনা-খিলাওনের সঙ্গে কুখ্যাত দস্যু উজাগর সিং, লাল্লোরাজা, দেবী সিং, লাম্পু ইত্যাদি যোগ দেওয়ায় তাদের শক্তি খুব বেড়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের পুলিশবাহিনী মধ্যপ্রদেশের পুলিশবাহিনীর সহায়তায় এক সংঘবদ্ধ প্রয়াসে হাসিনা-খিলাওনের দলকে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট হয়।

কানপুর-ব্যবসায়ীর পুত্রকে অপহরণের পরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে হামিরপুরের এস, পি,-কে দস্যু-সুন্দরী হাসিনাকে ধরবার জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী ডাকাতদের গুপ্ত আড্ডায় হানা দিয়ে দস্যু নাথু সিং আর রাজেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করে। নাথু সিং টিকমগড় জেলায় হাসিনার গোপন আস্তানার খবর দিয়ে দেয়। উত্তরপ্রদেশের পুলিশবাহিনী মধ্যপ্রদেশের টিকমগড়ে রওনা হয়। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের পুলিশকে এ-সম্বন্ধে কিছু জানায় না। খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে উত্তরপ্রদেশের পুলিশবাহিনী

চারিদিক থেকে হাসিনা-খিলাওনের গোপন আস্তানাকে ঘিরে ফেলে। হাসিনা এই সময় ছ' মাসের গর্ভবতী। শোনা যায় যে—কোনোরকম বাধা না-দিয়ে সে আত্মসমর্পণ করে এবং গর্ভের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে পুলিশকে অনুরোধ করে তাকে না-মারবার জন্যে। পুলিশ তাকে মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। হাসিনা প্রাণভিক্ষার আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ তার আবেদনে কান না-দিয়ে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে তার কয়েকজন সঙ্গীসাথীসহ গর্ভবতী দস্যুসুন্দরী হাসিনাকে হত্যা করে।

উত্তরপ্রদেশের পুলিশ কিন্তু এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য—সামনাসামনি সংঘর্ষে দলবলসহ হাসিনা-নিহত হয়।

হাসিনার গুলিবিদ্ধ নগ্নদেহ টিকমগড় কোর্ট গ্রাউণ্ডে প্রদর্শনীর জন্যে রেখে দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। সংবাদপত্রে এই কার্যের নিন্দা হয়। মধ্যপ্রদেশ পুলিশ হাসিনার এই নগ্নদেহ প্রদর্শনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

হাসিনার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ পুলিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। সংবাদপত্রে হাসিনার সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হবার পরে মৃত হাসিনা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যা-ই হোক, হাসিনা তার দলবলের কয়েকজনসহ নিহত হওয়ায় উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আতঙ্কিত নরনারী যে তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুন্দরী হলেও হাসিনা ছিল দস্যুনেত্রী, দস্যু হলেও হাসিনা ছিল নারী। তার শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে তাই রয়েছে মিশ্র অনুভূতি।

৫

॥ রামকলি ॥

কুন্তলার বাপের সঙ্গে ছিল ডাকাতদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শিশুবয়স থেকেই সেই দস্যুবৃত্তির চিত্র কুন্তলার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, আর রামকলীর স্বামীর সঙ্গে ছিল ডাকাতদের নিবিড় সম্পর্ক। সেই দস্যুদের সঙ্গে সে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করত। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের পরিহাসে সেই ডাকাতদের সঙ্গে রামকলিকেও যোগ দিতে হয় আর তার জীবনে ঘনিয়ে আসে অনিবার্য পরিণতি।

রামকলির জন্ম রাজস্থানের সয়াই মাধোপুর জেলার করৌলি থানার অন্তর্গত বউয়াপুরা। গাঁওয়ে (১৯৫৫ খৃঃ)। তার বাবার নাম ছিল নন্দুরাম। গাঁয়ের লোকেরা ডাকত 'নন্দে' বলে।

মাত্র দশবছর বয়সে কাশপুরা গাঁওয়ের সীতারাম মীনার ছেলে রামফুলের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয় আর রামফুলেরই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে রামকলিরই ছোট বোনের। বিয়ের পর পাঁচ বছর পরে তারা স্বামীর ঘর করতে যায়।

প্রথম কিছুদিন সুখেই তাদের দিন কাটে। রামকলির এক মেয়ে ও এক ছেলে হয়। কিন্তু এর পরেই তাদের দাম্পত্য জীবনে এক অশুভ কালোমেঘ ছায়া ফেলে।

সস্যুসর্দার লজারামের ভাইপো গোপালের সংগে রামফুলের ঘটনাক্রমে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। দস্যুবৃত্তিতে হাতে খড়ি হয় রামকলির স্বামী রামফুলের। এই নিষিদ্ধ পথ তার জীবনে উত্তেজনার খোরাক বয়ে আনে, সে ডাকাতদের সংগে নিয়মিতভাবে তাদের নিশীথ-অভিযানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।

রামকলি এদের গতিবিধি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করত এবং স্বামীর এই

নতুন জীবনের প্রভাব তার জীবনে অলক্ষ্যে ছায়া ফেলতে থাকে। ইতিমধ্যে ভাসলপুর থানার (জেলা সয়াই মাধোপুর) মরুদই গ্রামে পুলিশের সংগে সংঘর্ষে ডাকাত গোপালের সংগে রামফুলও মারা যায়

রামফুল মারা যাবার কিছুদিন পরে জেঠা রামদয়ালের সংগে রামকলির ঝগড়া হয়। (এদের সবার নামের সংগে সংযুক্ত 'রাম' শব্দটি লক্ষ্যণীয়। নামের সংগে 'রাম' যুক্ত থাকলেও এদের স্বভাবে 'রাবণ' ছায়া ফেলেছিল।) রামকলি তার স্বামীর সম্পত্তির ভাগ দাবী করে যাতে সে নিজের সন্তানদের ভালোভাবে মানুষ করতে পারে। একান্নবর্তী পরিবারের দোহাই দিয়ে রামদয়াল তার দাবী মানতে রাজী হয় না। সে নানাভাবে রামকলিকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু রামকলি নিজের দাবী ও সঙ্কল্পে অটল।

রামদয়াল যখন তার স্বামীর জমি তাকে দিতে কিছুতেই রাজী হয় না তখন রামকলি সরমথুরা থানায় গিয়ে রামদয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। পুলিশ বামদয়ালকে থানায় ডাকে এবং দু'জনাকেই বোঝায় যাতে ঝগড়াঝাটি না করে মিলে মিশে থাকে। রামকলি কিন্তু তার নিজের মত বদলায় না। আর ওদিকে রামদয়াল কিছুতেই তার স্বামীর সম্পত্তির ভাগ রামকলিকে আলাদা করে দিতে রাজী হয় না। ফলে রামকলি এক চরম পথ অবলম্বন করে।

ডাকাতদের সংগে স্বামীর মাধ্যমে আগেই তার জানাশোনা ছিল। ছেলে মেয়ে দুটিকে সে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দস্যু-সর্দার বাবুরামের দলে গিয়ে যোগ দেয়। রামকলি বাবুরামের রক্ষিতা হয়ে দস্যুবৃত্তির সব রকম কাজে দীক্ষা নিল এবং তারপর বাবুরামের সংগে রাজস্থান আর উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলে ডাকাতি করতে শুরু করে। এদের অপরাধের তালিকায় রয়েছে ট্রাক অপহরণ, বাসযাত্রীদের লুটপাট, মেলায় দোকানদার ও নরনারীর অর্থ-দ্রব্যাদি লুণ্ঠন ইত্যাদি।

রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় বসেরি থানার অন্তর্গত ভূতেশ্বরের

মেলা খুব বিখ্যাত। দূরে-দূরান্ত থেকে অসংখ্য নরনারী এই মেলায় আসে। জিনিষপত্র কেনা-বেচা নয় কেবল, শুধুমাত্র মেলা দেখবার জন্যেও কৌতূহলী নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ ভূতেশ্বরের মেলায় জড়ো হয়।

দস্যু বাবুরাম-রামকলির দল এই মেলায় এসে লোকজনের শুধু টাকাপয়সা লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয় না, এক যুবতীকেও অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এর পরের দিনই আবার তারা থানা গড়ী বাজনা অঞ্চলে এক যাত্রীবাহী বাসের সমস্ত সওয়ারীদের টাকাপয়সা কেড়ে নেয়। তার উপর রাজস্থান পুলিশের এক সিপাহী বদন সিং এবং শ্রীরাম নামে একজন ব্যবসায়ীকে মারধর করে। ডাকাতদলের এই অত্যাচার পুলিশের বিরুদ্ধে খোলাখুলি এক চ্যালেঞ্জ। ফলে পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে এই দস্যুদলের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযান চালায়। পুলিশ দলের সংগে

এই সংঘর্ষে রামকলি তার প্রেমিক দস্যুসর্দার বাবুরামের সংগে নিহত হয়।

প্রতিশোধস্পৃহার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল রামকলির জীবন।

৬

॥ সুমন শর্মা ॥

একুশ বছরের গৌরাংগী সুন্দরী সালোয়ার কামিজ পরিহিতা সুমন শর্মাকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে কলেজের ছাত্রী। অবিশ্যি একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে তার মুখে এক ধরণের 'বেপরোয়া স্বভাবের ছাপ দেখা যায়। গলায় আর হাতে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন যখন চোখে পড়বে তখন সুমনের দুঃসাহসী জীবন-পরিক্রমার পরিচয় পেতে আর দেরী হয় না।

সুমন শর্মা দিল্লী শহরের প্রথম নারী ডাকাত। কথায় কথায় অনায়াসে সে ছুরি চালায়, তলোয়ারের কোপ বসায়, অতি অনায়াসে পিস্তলের গুলিতে লক্ষ্য বিদ্ধ করে, দিল্লীর জনবহুল রাস্তা বা সরু গলি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটর সাইকেল বা ট্যাক্সি চালিয়ে যেতে তার অসুবিধে হয় না।

সুমনের আগে নাম ছিল কস্তুরী। তার জবানীতে জানা যায় যে—বুলন্দ শহরের গঙ্গেশ্বর গ্রামে তার জন্ম। তার বাবার ছিল কাপড়ের ব্যবসা। মায়ের ক্ষয়রোগ হবার ফলে সে দিদিমার কাছে এসে থাকে। সুমনরা পাঁচ ভাই বোন। যদিও সুমন দিদিমার কাছে থাকত সে বৃদ্ধা তার খোঁজ খবর রাখত না, তার কোনো নজরই ছিল না নাতনীর দিকে। ফলে অল্পবয়সেই অচিরে অসৎ সংসর্গে পড়ল সুমন। আর খারাপ কাজকর্ম করার ফলে সঙ্গীদের সঙ্গে সে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। অল্পবয়স দেখে পুলিশ সেবার অল্পের উপর দিয়েই ছেড়ে দেয় তাকে। ছাড়া পাবার পরে সে ঠিক করল আর খারাপ পথে যাবে না।

চর্খেওয়ালান গলিতে কমল তানেজা নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ নিল সুমন।

তানেজা পরিবারে তিনটি সন্তান। তারা সবাই সুমনকে স্নেহ করত। কিন্তু এই শান্তি সুমনের জীবনে স্থায়ী হলো না। অল্পদিনের মধ্যেই তার বাবা সেখানে এসে হাজির এবং অল্পবয়সের ছুতোয় সুমনের সে-কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। আর তারপর তাকে বিক্রি করে দেয় কল্যাণ পুরীর মীর সিং নামে একজন লোকের কাছে।

মীর সিং তাকে কিনে নিয়ে নিজের অপদার্থ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কারণ সম্বন্ধ করে সামাজিক ভাবে ছেলের জন্য কোনো পাত্রী খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউই রাজী হয় নি মীর সিংয়ের অতি অপদার্থ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে।

মীর সিংয়ের ছেলের অবস্থা জানার পরে সুমন পালাল সেখান থেকে। প্যালিয়ে গিয়ে আবার হাজির হলো তার দিদিমার বাড়ীতে। কিন্তু সেখানে এবার সে আশ্রয় পেল না। তার ঠাঁই হলো না মা বাবার কাছেও। বয়স কম বলে এবার তার মা-বাবার সম্পতি ছাড়া আগে যেখানে ঝিয়ের কাজ করত তারাও তাকে আর রাখতে রাজী হলো না।

জীবনের প্রারম্ভেই পৃথিবীর কঠিন দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সুমনের। বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তার মন বিষিয়ে গিয়েছিল স্বভাব হয়ে উঠেছিল উগ্র, বেপরোয়া। জানা যায় যে মাত্র বারো বছর বয়সে সে করোল বাগের একটি দুশ্চরিত্র যুবকের গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল। কারণ সেই যবা পুরুষটি সুমনের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে একটি সুকোমল কিশোরী ভেবে রেস্টোর‍্যাণ্টের নির্জন কেবিনে একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েছিল। ছুরি মারার জন্যে পুলিশ তাকে গেপ্তার করে নারী নিকেতনে পাঠিয়ে দেয়। বয়স কম বলে বাইশ দিন পরেই সে ছাড়া পায়।

জীবনের অতি অসহায় ও বিপর্যস্ত পর্যায়ে সুমনের সঙ্গে পরিচয় হয় সোনা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। সোনার মাধ্যমে কলুষিত অপরাধ

জগতের দাগী অপরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো তার। 'দুনম্বরী কাম' করতে শুরু করল সে। নাসিম এবং এনায়েৎ ছিল তার বস। চরস, গাঁজা—সব রকম নেশার চোরা কারবারে হাতেখড়ি হলো তার।

এই সময় গুড্ডু নামে এক ব্যাক্তির সঙ্গে পরিচয় হলো সুমনের। গুড্ডুকে ভালোবেসে ফেলল সে। গুড্ডুর প্রতি তার এক অপ্রতিরোধী আকর্ষণ জন্মাল। এমন কি প্রিয় বন্ধু সোনাকে একদিন সে ছুরিও মেরেছিল। কারণ যখনই সে গুড্ডুর সঙ্গে একান্তে মিলতে চাইত-সোনা সেখানে গিয়ে সর্বদা তাতে বিঘ্ন ঘটাত।

সুমনের জীবনের সব কথা জানত গুড্ডু। সুমন গুড্ডুকে কথা দিয়েছিল যে সে এই খারাপ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ভালোভাবে চলবে যদি গুড্ডু তাকে বিয়ে করে। কিন্তু গুড্ডু তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। গুড্ডু অবিশ্যি লক্ষীনগরে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে সুমনের সঙ্গে সে স্বামী স্ত্রী রূপে একবছর ছিল। শেষ পর্যন্ত গুড্ডু তাকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় সুমন অত্যন্ত রেগে গেল। মিথ্যে স্ত্রী হয়ে সে আর গুড্ডুর আশ্রয়ে থাকল না। সেখান থেকে চলে গিয়ে প্রেমদত্ত নামে এক ব্যক্তির পরিবারে বাস করতে লাগল সুমন। প্রেমদত্তকে সে ডাকত 'চাচাজী'—বলে। তার ঠাকুর্দার সঙ্গে একই জায়গায় কাজ করত প্রেমদত্ত।

গুড্ডু অবিশ্যি সুমনকে অন্যত্র বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সে-চেষ্টা সফল হয় নি। সুমন আপন সঙ্কল্পে অটল—বিয়ে যদি করতেই হয় তবে গুড্ডুকেই, অন্য কোনো পুরুষকে নয়। গুড্ডুর ব্যবহারে মর্মান্তিক দুঃখ পেয়ে সুমন দিল্লীর রেডলাইট এরিয়ায় গিয়ে দেহোপজীবিনী হয়ে অর্থোপার্জনের কথাও ভেবেছিল।

গুড্ডুর প্রতি সুমনের আকর্ষণ এতই প্রবল যে—'টাইগার' নামে এক অপরাধির দলে সে যোগ দিতে বাধ্য হয় যখন তারা গুড্ডুকে হত্যা করার হুমকি দেয়। টাইগারের দল সুমনের ছোটবোন এবং চাচাজীকেও মারবার ভয় দেখিয়েছিল। টাইগার অতি কখ্যাত দস্যু। তাকে গেপ্তারের জন্য

সরকার দশহাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সুমন তার দলবলের সঙ্গে ধরা পড়ে চাঁদনী চকে এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে (মে, ১৯৮১ খৃ)।

ধরা পড়বার আগে দীর্ঘ দশবছর সুমন অপরাধের জগতে বিচরণ করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলবার সময় জীবন সম্বন্ধে তার গভীর বিতৃষ্ণা বা তিক্ততার পরিচয় পওয়া যায় না। ছুরি বা বন্দুক চালনায় সে অনায়াস দক্ষতা অর্জন করেছে। তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—সে গুড্ডুকে বিয়ে করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের পথে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু গুড্ডু সমাজের একজন সম্মানিত নাগরিক তার মতো অপরাধিনীর সঙ্গে স্বাভাবতই সে জীবনের গ্রন্থীবন্ধন করতে চায় না। ফলে সুমনের ক্রুদ্ধ ঘোষণা—গুড্ড তাকে শাদী করতে রাজী না হলে 'গোলি সে উড়া দুঙ্গী।'

জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুমন অপরাধীর জীবন পরিত্যাগ করতে চেয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বারবার তাকে অপরাধের পিচ্ছল পথে ঠেলে দিয়েছে। একবার অপরাধের ছাপ গায়ে লেগে গেলে কেউ আর তার ভালো পথে থাকার ইচ্ছাকে বিশ্বাস করতে চায় না।

তবে সৎ পথে থেকে ভালোভাবে বাঁচবার ইচ্ছা মরে যায় নি সুমনের মনে। অপরাধের শাস্তি শেষ হয়ে গেলে মুক্তি পেয়ে যখন সে কারাপ্রাচীরের বাইরে আসবে—তখন সে আর পুরনো পাপের পথে ফিরে যেতে চায় না, চায় না অতীতের পাপ সংগীদের সংগে কোনো সম্পর্ক রাখাতে।

কিন্তু একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে—সুমন তার এই সঙ্কল্পে সুস্থির থাকতে পারবে কিনা, পারবে কিনা শেষ পর্যন্ত দুঃখ যন্ত্রণার পারাবারে পাড়ি দিয়ে শান্তির সূর্যালোকিত দ্বীপে পা ফেলতে।

৭

॥ মীরা ঠাকুর ॥

উনিশ বসন্তে পা দিয়েছে সে মেয়েটি। মাজা মাজা গায়ের রঙ, সুতনুকা, চেহারায় ভদ্র পরিবারের ছাপ। তার দীঘল আয়ত চোখ আর সুন্দর চেহারার জন্যে গোয়ালিয়রের জিবানী রাও য়ুনিভার্সিটির ছেলেরা তার নাম দিয়েছিল 'হেমা মালিনী।' বস্তুত চলচ্চিত্রের অনেক নায়িকার চেয়ে সে কম সুন্দরী নয়।

অনেক ছেলে আবার তাকে 'সাইকেলওয়ালী' নামেও ডাকত (পরবর্তীকালে অবিশ্যি যথার্থই সে 'বন্দুকওয়ালী' হয়ে উঠেছিল)। কারণ য়ুনিভার্সিটিতে মেয়েটি সাইকেল চালিয়েও আসত। স্মার্ট, নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে এই মেয়েটি তার চারপাশের যুবকদের মন জয় করে নিয়েছিল। মীরা ঠাকুর নামের এই মেয়েটিকে নিয়ে গোয়ালিয়রে তখন বহু কথা-কাহিনী, স্বপ্ন ও স্বপ্নভংগ।

গোয়ালিয়রে এক সাধারণ পরিবারে মীরার জন্ম। কিন্তু যৌবন-সমাগমে নিজ স্বভাব ও সৌন্দর্যগরিমায় সে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেও গোপাল নামে এক কুখ্যাত ছাত্র-নেতার সংস্পর্শে এসে তার পড়াশুনো আর বেশী এগোয় নি। অসৎ সংসর্গের কলুষিত প্রভাবের প্রবাহে মীরা ওমপ্রকাশ ওরফে 'গ্যামব্লার' নামে এক অপরাধীর সহচর্যে এসে পুরোপুরি অপরাধের জগতে জড়িয়ে পড়ে।

বহু অপরাধীর সঙ্গেই মীরার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। 'কলগার্ল'রূপে তার অর্থ-উপার্জনের কথাও জানা যায়।

ধরমপাল নামে আর একজন ডাকাতের সংগে মীরার এক সময় খুব

অন্তরঙ্গতা ছিল। কিন্তু মীরার বহুবল্লভা স্বভাবে বিরক্ত হয়ে ধরমপাল তাঁকে পরিহার করে। ফলে সে গোপালের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়।

এরপর সে গোপাল ও 'গ্যামব্লা'রকে নিয়ে কুখ্যাত ত্যাগী ডাকাত-দলের সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে তার ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়। দস্যুবৃত্তিতে সে এদের পরামর্শ দিত, অস্ত্রশস্ত্র রাখার দায়িত্বও ছিল তার।

ত্যাগী দস্যুদলের বিনোদ ত্যাগী ছিল পুলিশ কনেস্টবল। তার বড় ভাই ঈশ্বর ত্যাগী বাগপটে পুলিশের হাতে নিহত হলে সে পুলিশবাহিনী ত্যাগ করে এবং বড় ভাইয়ের পরিত্যাক্ত অস্ত্রশস্ত্রের ভার নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে—বাগপট হত্যাকাণ্ডের সে প্রতিশোধ নেবে। বাগপট থানার সাবইনস্পেক্টর নরেন্দ্র চৌহান রাখীর দিনে বোনের বাড়ী থেকে রাখী বেঁধে যখন মোটর সাইকেলে ফিরছিলেন বিনোদ ত্যাগী তাকে অব্যর্থ লক্ষ্যে হত্যা ক'রে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। ঈশ্বর ত্যাগী মারা গিয়েছিল নরেন্দ্র চৌহানের গুলিতে।

পুলিশের বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যকৌশলে, নাটকীয়ভাবে, বিনা রক্তপাতে দুর্ধর্ষ ডাকাত বিনোদ ত্যাগী দিল্লীর নারায়না বিহারে ধরা পড়ে ১৫ই আগষ্ট, এবং কিছুদিন আগেই ধরা পড়েছিল ধরম পাল, রাজবীর সিং এবং 'হিটলার' (ঈশ্বর সিং)। গোপাল, 'গ্যামব্লার' (ওম প্রকাশ) এবং মীরা ঠাকুর গ্রেপ্তার হয় বিনোদত্যাগী ধরা পড়বার পরের দিন। এদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে রয়েছে নরহত্যাও।

ধরা পড়বার সময় মীরার সাজসজ্জা ছিল বড় ঘরের মেয়েদের মতো—আঁকা ভ্রূ, প্রসাধিত মুখমণ্ডল, স্বর্ণালংকার ভূষিতা—যেন প্রেমিকের অপেক্ষায় ফাইভ স্টার হোটেলের পার্টিতে যাবার জন্যে তৈরী। পুলিশ যখন তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে তখন যাবার আগে উঠে সে গোপালের পদস্পর্শ ক'রে প্রণাম ক'রে—যেমনভাবে করে পতিপরায়ণা বধূরা।

॥ মীরা ঠাকুর ॥ (দুই)

দ্বিতীয় মীরা ঠাকুর ছিল পরমাসুন্দরী। সব নারী-ডাকাতদের মধ্যে মধ্যে সে-ই সব চেয়ে বেশী রূপসী। দীর্ঘ দেহ বল্লরী, প্রতিমার মতো মুখ, এক রাশ ঘন কালো চুল তার যৌবনদীপ্ত চেহারাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

বেহমাই গ্রামের হত্যাকাণ্ডে ফুলনদেবীর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিল বলবান গাদারিয়া। পুলিশের সংগে সংঘর্ষে বলবান মারা যায় ২৪শে ফেব্রুয়ারী, মীরা ছিল এই বলবানের উপপত্নী। ঐ দিনের সংঘর্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল মীরা। কিন্তু পুলিশের হাত থেকে কোনোক্রমে বেঁচে গিয়েছিল সে।

চব্বিশ বছরের পূর্ণ যুবতী অপরূপ রূপবতী দস্যু সুন্দরী মীরা ঠাকুরের গ্রেপ্তারের জন্যে আড়াই হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল।

কানপুর জেলায় কিশানপুর গ্রামে তার জন্ম। এক দরিদ্র ঠাকুর ঠাকুর পরিবারের সে ছিল একমাত্র কন্যা। মধ্যপ্রদেশের বিন্দে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সে-বিয়ে সুখের হয়নি। স্বামীর ঘর ছেড়ে সে নিজ গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফেরার পরে ডাকাত বলবান গাদারিয়ার সংগে তার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ফলে বলবানের সংগে সে-ও দস্যুবৃত্তিতে যোগ দেয়।

বলবান মূলত বিক্রম মাল্লা-মুস্তাকীমের দলে ছিল। পরে নিজে সে একটা ছোট ডাকাত দল গড়ে তোলে। বলবানের মৃত্যুর পরে মীরা লালারাম-শ্রীরামের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বলে শোনা যায়। বলবানের দলের কয়েকজন ডাকাত শেষ পর্যন্ত মীরার সঙ্গে ছিল।

পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মীরা অনেক চেষ্টা করেছে; শোনা যায় সে নাকি অনেকদিন মজদুরনীর বেশে-ও কাটিয়েছে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। কিন্তু তার দিন শেষ হ'য়ে এসেছিল। পুলিশের লোক সর্বদা তার পিছে পিছে ঘুরছিল।

অবশেষে উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলার ধারানা গ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সংগে দীর্ঘ ছ' ঘণ্টা ব্যাপী এক প্রচণ্ড সংগ্রামের পরে মীরা নিহত হয়। তার সংগে মারা যায় আরও পাঁচজন ডাকাত— মুরান্দ কাচ্চি (তার কাছে ছিল একটি আমেরিকান ০.৩১৫ বোর রাইফেল, আর মীরার কাছে SBBL বন্দুক), দুর্গা কোরি, ব্রিজেলাল ওরফে বিজে, শিবরাম এবং বদন মাল্লা। বিশ্বনাথ সিং নামে একজন পুলিশ কনস্টেবলও মারা যায় ডাকাতদের সংগে লড়াইয়ে আর চারজন কনস্টেবল গুরুতররূপে আহত হয়। এই ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নরহত্যা, ডাকাতি, অপহরণ ইত্যাদি।

এক অপরূপ রূপবতী নারীর কী শোচনীয় পরিণতি।

॥ আরো কয়েকজন নারী ডাকাত ॥

॥ এক ॥

এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে—কিন্তু নারী-ডাকাতদের অধিকাংশই আকর্ষনীয়া সুন্দরী। সব নারী-ডাকাতই তাদের বিকশিত যৌবনে এই রূপ-সম্ভার নিয়ে দস্যুবৃত্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই রূপ মদিরার মোহে একদিকে যেমন বহু বিভ্রান্ত যুবা তাদের দলে সামিল হয়েছে, তেমনি আবার এই রূপ-যৌবনই দেখা দিয়েছে তাদের বিনাশের অন্যতম কারণরূপে। প্রেমিক ডাকাতদের সঙ্গে মিলনে গর্ভে সন্তান ধারণ এই দুর্ভাগিনী নারী ডাকাতদের অনেকের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

চম্বল ভ্যালির শেষতম যে-নারী ডাকাতের কথা শোনা যায় তার নাম কমলা (বা কমলিয়া)। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তন্বী রূপসী কমলার জন্ম এক ব্রাহ্মণ পরিবারে, মধ্যপ্রদেশের গাড়ী গ্রামে। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তার বিয়ে হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। তাই সেই অসুখী বিবাহিত জীবনের বন্ধনে সে বেশীদিন আবদ্ধ থাকে নি। রামবাবু নামে এক দুষ্প্রকৃতির ব্যক্তির সঙ্গে কমলার

অবৈধ সম্পর্ক ঘটে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশের হাত এড়িয়ে তারা ডাকাত কাপ্টান সিংহের দলে যোগ দেয়। বহু ডাকাতির অভিযোগ এই দলের বিরুদ্ধে। পুলিশ এখনও তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের জীবনেও ঘনিয়ে আসছে অনিবার্য পরিণতি।

॥ দুই ॥

রেডি নামে আর এক ষোড়শী ডাকাত কিছুদিন আগে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে ভীতির সৃষ্টি করেছে। উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর জেলার ছর্খারি থানার অন্তর্গত এক গ্রামে পাঞ্জাবী পরিবারে তার জন্ম।

রেডির বাবা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে একবার বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু আর ফিরে না আসায় রেডি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং ছতারপুর এসে সর্দার গিরধরা সিংহের সঙ্গে বাস করতে থাকে (১৯৭৯ খৃঃ)। একদিন রাতে গিরধরা সিংয়ের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে এবং ডাকাতরা তাকে খুন করে রেডিকে তুলে নিয়ে যায়। সেই ডাকাতদলের নেতা ছিল হিন্দুপট।

হিন্দুপট আগে থাকতেই রেডিকে জানত। কারণ রেডির এক অল্পবয়স্ক ভাই গুড্ডু তার দলভুক্ত ছিল। হিন্দুপটের কবলিত হয়ে রেডির দস্যুবৃত্তিতে দীক্ষা হয়। এই ডাকাতদের সঙ্গে ডাকাতি, অপহরণ, নরহত্যা ইত্যাদি অপরাধে অংশগ্রহণ করেছে বলে রেডির বিরুদ্ধে অভিযোগ।

॥ তিন ॥

মহারাষ্ট্রের আমমহ নগরে যে নারী-ডাকাতটি উল্লেখযোগ্য তার নামই হলো রূপবতী।

রূপবতী উনত্রিশ বছর বয়সে দুটি সন্তান নিয়ে বিধবা হয়। স্বামী মারা যাবার পরে তার জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় ছিল না এবং

কিছুদিন পরে প্রকৃতপক্ষে অন্নাভাবে সে উপবাস করতে শুরু করে। এই সময় একদিন রাতে এক ব্যক্তি তার ঘরে এসে তাকে কিছু টাকা দেয় এবং বিনিময়ে রূপবতীকে একটি প্যাকেট নিকটবর্তী গ্রামের বিশেষ একটি জায়গায় পৌঁছে দিতে বলে। চরম অভাবের দিনে দেবদূতের মতো যে-লোকটি রূপবতীর জীবনে আবির্ভূত হলো আসলে সে ছিল এক চোরা কারবারী। তার ছিল নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। নাম ইসমাইল।

ইসমাইলের মাধ্যমে রূপবতী অর্থোপার্জনের একটা পথ খুঁজে পেল। শুধু তাই নয়, মাস ছয়েকের মধ্যে এই চোরা কারবারী ব্যবসায়ে সে ইসমাইলকে পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল। মারিজুয়ানা এবং অন্যান্য মাদক পানীয়ের আন্তঃরাজ্য চোরা ব্যবসায়ে রূপবতী ক্রমে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে ওঠে। অপধারের অন্ধকার জগতে পদচারণা করতে করতে তার মধ্যে জন্ম নেয় এক নির্ভীক নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর রমনী।

জব্বার নামে এক চোরা কারবারী একবার তার কাছ থেকে মারিজুয়ানা নিয়ে দাম দিতে অস্বীকার করে। রূপবতী নিঃশঙ্ক চিত্তে নির্দ্বিধায় তাকে পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করে। শুধু তাই নয়—জব্বারের ভাইকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে।

এই রকম যার প্রকৃতি, আশ্চর্য নয় যে খৃষ্টাব্দের মধ্যে সে মহারাষ্ট্রের এক ভয়ঙ্করী আতঙ্ক। যৌবজীবনে রূপবতীর কোনো আকর্ষণ ছিল না, বরং এ-ব্যাপারে সে ছিল কঠোর নীতিপরায়ণ। কিন্তু রক্তাক্ত সংঘর্ষে তার ছিল দুরন্ত স্পৃহা। স্বল্পকালীন অপরাধী জীবনে সে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপবতী নিহত হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য—রূপবতীর সমকালে দিল্লীর আনন্দ পর্বত অঞ্চলে একজন দুঃসাহসী নারী অপরাধী নিষিদ্ধ মাদক পানীয়ের ব্যবসায়ে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। তার নাম ময়না।

॥ চার ॥

আর এক দুর্ভাগিনী বধূ ভাগ্যের পরিহাসে দুঃসাহসী ডাকাতে পরিণত হয়েছিল। তার নাম মুন্নী বাঈ।

মধ্যপ্রদেশের মোরেশ জেলায় সদাবলী গ্রামে মেঘসিংহের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে সে শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর ঘর করতে যায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। স্বামী ছিল অত্যন্ত নিস্তেজ প্রকৃতির লোক। নববধূকে পীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার পরিবর্তে সে-ও পিতামাতার অত্যাচারে যোগ দিত। এইভাবে শ্বশুর বাড়ীতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে মুন্নীবাঈ বাপের ঘরে ফিরে আসে

তখন তার বয়স কুড়ি। একদিন ক্ষেতে যখন সে কাজ করছিল কাপ্টেন সিং নামে একজন ডাকাত তখন সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী মুন্নীবাঈকে দেখে কাপ্টেনের মনে লালসার আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় নিষ্পাপ মুন্নীবাঈয়ের জীবন—কাপ্টেন তাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে নিজের উপপত্নী রূপে রাখে।

ডাকাতদলের মধ্যে অবশ্যি প্রথমে এই 'লুটের মাল' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। সবাই তাকে উপভোগের জন্যে লোলুপ। কিন্তু নিজ শক্তি ও বুদ্ধির বলে শেষ পর্যন্ত সে একমাত্র সর্দার কাপ্টেন সিংয়ের রক্ষিতা হয়ে রইল। দস্যুবৃত্তিতে পাঠ নিয়ে ডাকাতদের সংগে ডাকাতিতে যোগ দিতে লাগল মুন্নীবাঈ, সে হয়ে উঠল আর এক দুর্ধর্ষ নারী-ডাকাত, জীবন্ত আতঙ্ক। মধ্যপ্রদেশ সরকার তার মাথার উপর পুরস্কার ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

পুলিশের ক্রমাগত আক্রমনের ফলে যখন কাপ্টেন সিংহের দলে ভাঙ্গন

দেখা দিল তখন মুন্নীবাঈ এক আলাদা ডাকাতদল গঠন করল। দস্যু বৃত্তিতে সে কোনো করুণা দেখায় নি। মেয়েদের শরীর থেকে জোর করে সোনার গহনা ছিনিয়ে নিতে তার কোনো দ্বিধা হতো না। মেয়েরা কোনোভাবে বাধা দিলে মুন্নীবাঈ তাদের কঠোরভাবে গালাগালি দিত।

খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুন্নীবাঈ তার ৩০৩ রাইফেলসহ রাজস্থান পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সঙ্গে ছিল তার আরও সাতজন সহযোগী ডাকাত। মুন্নীবাঈয়ের তখন পরনে ছিল পুলিশের য়ুনিফর্ম, মাথায় গোলাকার সরকারী টুপি, ডান হাতে ঘড়ি অন্য হাতে নীল কাঁচের চুড়ির গোছা, নাকে সোনার রিং। ধরা দেবার আগে তার একমাত্র দুঃখ যে শ্বশুর বাড়ীর নির্মম লোকেদের সে গুলিতে উড়িয়ে দিতে পারল না, পারল না, অপদার্থ ভীরু স্বামীর নাক কেটে দিতে।

মুন্নীবাঈয়ের শিশু-সন্তানের নাম হেমেন্দ্র। আত্মসমর্পনের সময় পুলিশের কাছে সে তার মনের বাসনা ব্যক্ত করেছিল—"হেমেন্দ্রকে আমি পুলিশ অফিসার বানাতে চাই।"

মুন্নীবাঈয়ের এই ইচ্ছার মধ্যে তার নিজের অপরাধী জীবনের প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে।

সবারই কামনা—মুন্নীবাঈয়ের সঙ্গে তার মতো অন্য অপরাধীর জীবন উপলব্ধির আলোকে সংশোধিত হোক, অন্ধকার জগৎ থেকে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক, তাদের সন্তানেরা সৎ শিক্ষা পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। পিতামাতার অসামাজিক জীবনের কলঙ্ক মালিন্য যেন তাদের জীবনকে স্পর্শ না করে।

———